সভ্যতার বিকাশ : এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে নগরায়ণ ও রাষ্ট্র

কৃষিকাজের প্রচলনে ও স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রপাত, ধাতু হিসেবে ব্রোঞ্জের ব্যবহার, সমুদ্র ও স্থলপথে বাণিজ্যের বিস্তার, লিখন শৈলীর আবিষ্কার এবং সমাজ ও পেশাগত ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণিভেদ, সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি শাসক-পুরোহিত-কেরানি শ্রেণির উদ্ভব মিলিয়ে মানুষ বিভিন্ন স্থানে সুপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, স্থাপত্য, প্রাসাদ, ধর্মীয় স্থাপত্য, সাধারণ মানুষের বসবাসের আলাদা এলাকাসহ নগর তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রেই এই নগরগুলো এক একটি রাষ্ট্র ছিল। নগরের বিকাশের মাধ্যমে সমাজ-ধর্ম-শাসন-অর্থনীতিতে যে বড় বদল এলো, তাকেই নগরায়ণ বলা হয়ে থাকে। এই নগরায়ণ ছিল মানুষের ইতিহাসে প্রথম সভ্যতা গড়ে তোলার একটি লক্ষণ।

সভ্যতার বিকাশকে সরলভাবে মানুষের উন্নতি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সভ্যতার ভালো দিকের পাশাপাশি মন্দ দিকও ছিল। মানুষ প্রযুক্তিগত উন্নতি করছে, নতুন নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করছে, সাহিত্য সৃষ্টি করছে, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে। এগুলো ভালো দিক। মন্দ দিকগুলো হলো মানুষে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভেদ বেড়েছে, হানাহানি বেড়েছে, বিরাট পরিসরে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ হচ্ছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে, শাসকশ্রেণি হিসেবে একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে। মানুষকে বন্দী করে দাস হিসেবে অত্যাচার করা হচ্ছে। দাসদের দিয়ে সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজগুলো করানো হচ্ছে।

চলো, আমরা সভ্যতার আরও কিছু ভালো ও মন্দ দিক খুঁজে বের করি :

আমরা এরপর সভ্যতা সম্পর্কে যতই জানব, পাশাপাশি এর ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে চিন্তা করব আর এই

	সভ্যতার ভালো দিক	সভ্যতার মন্দ দিক
১		
২		
৩		
৪		

তালিকায় যোগ করব।

বেশির ভাগে প্রথম দিককার সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল নদীবিধৌত উর্বর সমতলভূমিতে। এই নদী অববাহিকাগুলো কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল। নদীপথে যোগাযোগ ও য়বাণিজ্যের সুবিধা দিয়েছিল। প্রতিটি সভ্যতার এই বিশেষ ভূগোল-নির্ভরতা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা এই অধ্যায়ে সবগুলো সভ্যতা নিয়ে আলাপ করতে পারবো না। আফ্রিকা মহাদেশে বিকশিত মিসরীয় সভ্যতা, এশিয়া মহাদেশে বিকশিত মেসোপটেমীয় সভ্যতা আর ইউরোপে তুলনামূলকভাবে অনেক পরে বিকশিত গ্রিক ও রোমান সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই তোমরা জানতে পারবে। বড় হয়ে এসব সভ্যতা, সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি, মানুষের জীবনযাপন নিয়ে অনেক বেশি জানতে পারবে।

সমভূমি

তোমরা তো বিভিন্ন ধরনের ভূমিরুপ সম্পর্কে জানতে পেরেছ যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রাকৃতিক গঠন। সেখানে আছে পাহাড়ের মতো কিছু আকর্ষণীয় ভূমিরূপ । আবার কিছু ভূমিরূপ আছে যা সমান বলে মনে হয় মানে খুব বেশি উঁচু নয় (৩০০ মিটারের বেশি নয়)। আসলে সেই সব ভূমিরূপকে সমতল ভুমি বা সমভূমি বলা হয়। সমতল ভূমি সাধারণত বিশাল এলাকা যা বেশির ভাগ সমতল।

চলো জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সমতল ভূমি গঠিত হয়।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে প্রথম সমভূমি আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা তৈরি হয়েছিল। লাভা পৃথিবীর উপরিভাগে ধাক্কা খেয়ে কিছু এলাকাকে সমতল করে তুলেছিল।

কিছু সমভূমি ক্ষয় দ্বারা গঠিত হয়েছে। যখন বাতাস, বরফ বা পানি ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় ভূমির কিছু অংশ ধুয়ে যায়। আবার ভাঙন প্রক্রিয়া পাহাড়ি জমিকে সমতল ভূমিতে পরিণত করতে পারে।

সমভূমি প্রতিটি মহাদেশে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ভূমি হচ্ছে সমভূমি।

তোমরা তো আলাদাভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক কাঠামো বা ভৌগোলিক অবস্থান, যেমন- নদী, মরুভূমি, বদ্বীপ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছ। এগুলোর চমৎকার অভিধানও তৈরি করেছ। এবারে এই যে বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস আমরা জানব, সেখান থেকে প্রতিটি সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করবো। সেগুলো সভ্যতার বিকাশে বা বিলুপ্ত হওয়া বা অন্য কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা আমরা খুঁজে বের করবো :

সভ্যতার নাম : _____

যে প্রাকৃতিক কাঠামো বা কাঠামোগুলো প্রভাব ফেলেছে তার নাম: _____

_____

কীভাবে প্রভাব ফেলেছে : _____

প্রাকৃতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, কল্পনা করে তার ছবি আঁকি :

সভ্যতার নাম: _____

যে প্রাকৃতিক কাঠামো বা কাঠামোগুলো প্রভাব ফেলেছে তার নাম: _____

_____

কীভাবে প্রভাব ফেলেছে: _____

প্রাকৃতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলেছে কল্পনা করে তার ছবি আঁকি :

সভ্যতার নাম: _____

যে প্রাকৃতিক কাঠামো বা কাঠামোগুলো প্রভাব ফেলেছে তার নাম : _____

_____

কীভাবে প্রভাব ফেলেছে : _____

প্রাকৃতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলেছে কল্পনা করে তার ছবি আঁকি :

একই সভ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠামোর প্রভাব থাকতে পারে। প্রয়োজন বোধে খাতায় বাকি কাজগুলো করতে পারো।

মিসরীয় সভ্যতা: নীল নদের দান

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম মিসরীয় সভ্যতা। সভ্যতাটি নানা দিক থেকেই বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসে তার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উর্বর ভূমির কারণে মিসরে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রত্নস্থানও পাওয়া যায়। যেমন–মেরিমদে, বাদারি, ফাইয়ূম প্রভৃতি মিসরের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির অন্যতম প্রত্নস্থান।

মিসরীয় সভ্যতার লিপি ছিল চিত্রলিপি। এই লিপি এই সভ্যতার বিভিন্ন স্থাপত্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় পাথরে আর সেই সময়ে তৈরি করা প্রথম কাগজে। এই কাগজের নাম ছিল প্যাপিরাস। এই লিপির নাম হায়ারোগ্লিফিক। অনেক পরে আবিষ্কৃত রোজেটা পাথরে হায়ারোগ্লিফিকসহ মোট তিনটি ভাষায় কিছু বিষয় লিখিত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় এই লিপি পড়া সম্ভব হয়েছিল। হায়ারোগ্লিফিক শব্দের সাধারণ অর্থ হলো 'পবিত্র লিপি'। এগুলো ছিল মূলত চিত্রলিপি। মিসরীয়রা এই ধরনের সর্বমোট ৭৫০টি চিত্রলিপির ব্যবহার জানতো। বিভিন্ন স্থান থেকেই প্রচুর পরিমাণে হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লেখা তথ্য পাওয়া যাওয়ায় মিসরীয় সভ্যতার সমাজ, রাষ্ট্র, শাসন, ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

অবস্থান ও সময়কাল:

মিসরীয় সভ্যতা আফ্রিকা মহাদেশের মিসরে নীল নদ অববাহিকায় বিকশিত হয়েছিল। এর দক্ষিণে নুবিয়ার মরুভূমি, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে লিবিয়ার সাহারা মরুভূমি এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর রয়েছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীল নদটি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে উৎপত্তি লাভ করে নানা দেশ হয়ে মিসরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। এর প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে মিসরের দক্ষিণাঞ্চলকে উচ্চ মিসর ও উত্তরাঞ্চলকে নিম্ন মিসর বলা হয়ে থাকে। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে মিসরীয়দের ধর্ম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও নীল নদের প্রভাব ছিল। এর সত্যতা অনুধাবন করে ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিসর দেখেছেন, সে অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন যে, এটি একটি স্বোপার্জিত দেশ, নীল নদের দান।' মিসরের প্রাণ নীল নদের কারণে মানবসভ্যতার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতার সূচনা হয়েছিল।

সময়কাল:

মিসরীয় সভ্যতা আনু: ৩১৫০ প্রাক-সাধারণ অব্দ থেকে আনু: ৩০ প্রাক-সাধারণ অব্দ পর্যন্ত ৩০০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল।

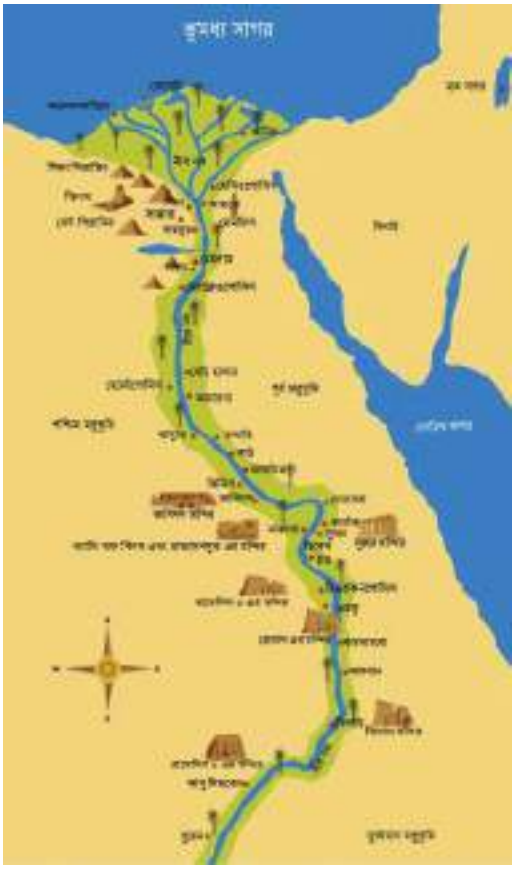

নীল নদের প্রবাহ ধরে মিশরের গুরুত্বপূর্ণ নগর ও প্রত্নস্থান (www.final.ie)

নদী ও বদ্বীপ

নদী সাধারণত মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা ঝরনাধারা, বরফগলিত স্রোত যা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে প্রবাহ শেষে সাগর, মহাসাগর, হ্রদ বা অন্য কোন নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়। যদিও নদীগুলি পৃথিবীর মোট জলভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ ধারণ করে, তবুও তারা মানব সভ্যতার জন্য সর্বদা অপরিহার্য। নদীগুলি সারা পৃথিবীজুড়ে মানুষ, গাছপালা এবং প্রাণীদের কাছে মিষ্টি পানির এক উৎস হিসেবে কাজ করে। তারা উপত্যকা এবং গিরিখাত খোদাই করে ভূমিকে আকার দেয়।

নদীগুলো কীভাবে প্রবাহিত হয়

একটি নদী উঁচু ভূমিতে পানির একটি ছোট ধারা হিসেব শুরু হয়। এ পানি বৃষ্টিপাত থেকে, তুষার বা বরফ গলে, অথবা একটি ঝরনার মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে আসতে পারে। উঁচু ভূমির গতিপথে নদী দ্রুত প্রবাহিত হয়। এটি জমি কেটে মাটি ও নুড়ি তুলে নেয়। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, নদী এভাবে গিরিখাত এবং গভীর উপত্যকা তৈরি করে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো মালভূমি নদী দ্বারা গঠিত এবং একটি নদী পৃথিবীরপৃষ্ঠে কী ধরনের পরিবর্তন করতে পারে তা দেখায় আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নিচে জাম্বেজির বিশাল গিরিখাত।

মাঝপথে নদীটি মৃদু ঢাল বেয়ে প্রবাহিত হয়। এটা তখন বড় এবং ধীর গতির হয়। তখন মাটি, নুড়ি এবং বালির নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করে। এই উপাদানের কিছু অংশ দ্বীপ গঠন করে।

সবশেষে নিম্ন গতিপথে নদী আরও ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। তখন আরও কঠিন উপাদানগুলো তলানিতে চলে যেতে শুরু করে এবং কিছু কিছু উপাদান নদীর মুখের দিকে বাহিত হয়– যেখানে নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই উপাদানগুলোই একত্রিত হয়ে একসময় বদ্বীপ নামক ভূমি তৈরি করে। তোমরা কি জানো আমাদের বাংলাদেশ ও এমনই একটা বদ্বীপ?

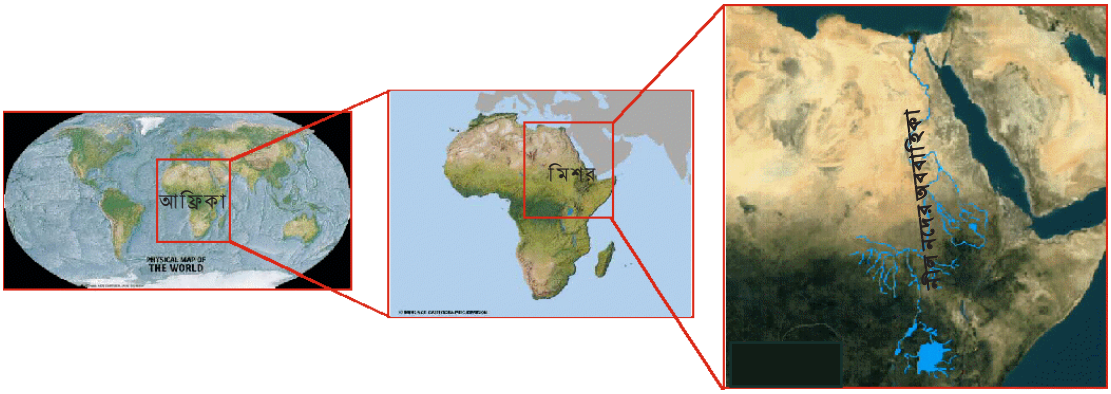

বিশ্বের মানচিত্রে মিসরের অবস্থান

এই বই-এ বিভিন্ন মানচিত্র দেওয়া আছে। চলো আমরা নিজে নিজে আফ্রিকা মহাদেশের একটি বড় মানচিত্র এঁকে তার উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব, পশ্চিমে কী কী আছে তা মানচিত্রে চিহ্নিত করি। এরপর দুটি ভিন্ন রং দিয়ে উচ্চ আর নিম্ন মিশরকে আলাদা করি:-

মিসরের তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাস। সবার উপরে ফারাও আর ফারাওয়ের নিচে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পেশার মানুষ অনেকটা পিরামিডের মতন বিস্তৃত।

সমাজব্যবস্থা:

প্রাচীন মিসরের সমাজব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এগুলো হলো-

উচ্চশ্রেণি: এই শ্রেণিভুক্ত ছিল রাজপরিবার, অভিজাত গোষ্ঠী, পুরোহিত গোষ্ঠী প্রভৃতি।

মধ্যশ্রেণি: এই শ্রেণিভুক্ত ছিল বণিক ও কারিগর গোষ্ঠীর মানুষ।

নিম্নশ্রেণি: মূলত কৃষক ও ভূমিদাসেরা এই শ্রেণিভুক্ত ছিল।

নারীর অবস্থান: প্রাচীন মিসরের সমাজে নারীরা উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সমাজের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। মাতৃতান্ত্রিক নিয়মে ছেলে ও মেয়েরা মায়ের কাছ থেকেই মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করতো। রাজপরিবারের রক্ত যাতে বাইরে না যায় তার জন্য ভ্রাতা-ভগ্নির মধ্যে বিবাহের রীতি চালু ছিল।

রাজনৈতিক ইতিহাস:

মিসরীয়দের শাসকের উপাধি ছিল ফারাও। তারা নিজেদের সূর্যদেবতা 'রা' বা 'আমন রে'-এর সন্তান মনে করতেন এবং তিনি তার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। তবে আনু: ৩৫০০ প্রাক-সাধারণ অব্দে মিসরীয়রা যে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নার্মার প্লেটে, যেটি রাজা নার্মারের প্রসাধনী রাখার পাত্র ছিল। এর এক পাশে রাজা মেনেস বা নার্মারকে বেলুন আকৃতির মুকুট পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়; যেটি উচ্চ মিসরের প্রতীক। আর প্লেটের অপর পাশে তাকে লাল মুকুট পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, যেটি নিম্ন মিসরের প্রতীক। তিনিই প্রথম দুটো মিসরকে একত্রিত করেন, যার রাজধানী ছিল উচ্চ মিসরের মেম্ফিসে। প্রাচীন মিসরে ৩১টি রাজবংশ প্রায় ৩০০০ বছর ধরে রাজত্ব করেন।

মন্দির ও ভাস্কর্য :

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় পরের দিকে পিরামিডের বদলে বহু ধর্ম মন্দির তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল কার্নাক ও লাকজোরের মন্দির। মিসরের অপর উল্লেখযোগ্য শিল্প-নিদর্শন হলো আবুসিম্বেল-এর মন্দির এবং বিশালাকার 'স্ফিংস'-এর মূর্তি। এ ছাড়াও এগুলোতে বিশালাকার ভাস্কর্যের সমন্বয় ঘটেছে।

অর্থনীতি:

কৃষি, পশুপালন ও শিল্প-বাণিজ্যের ওপর মিসরের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল। নীলনদের উভয় তীরের উর্বর ভূমিতে কৃষিকাজ হতো। এসময় গম, যব, তিসি, ভুট্টা, শাকসবজি ও শণ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। তাদের প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশু ছিল ছাগল, ভেড়া, গরু, শূকর প্রভৃতি। নীল নদের উভয় তীরের তৃণভূমি অঞ্চলে পশুচারণ ও পশুখাদ্যের সুবিধা মিলেছিল। প্রাচীন মিসরে মৃৎশিল্প, কোচ শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প এবং নৌযান তৈরির শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। ইজিয়ান দ্বীপ, ক্রিট ছাড়াও সিরিয়া, ফিনিসিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মিসরবাসী বাণিজ্য চালাতো। বাণিজ্যের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে তারা তামা ও সোনার মুদ্রা ব্যবহার করতো। তাদের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল গম, লিনেন কাপড়, স্বর্ণালংকার, সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র প্রভৃতি। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উটপাখির পালক, হাতির দাঁত, ধাতুর অস্ত্র, মসলা, কাঠ, সোনা, রুপা প্রভৃতি।

ছাগল প্রজনন এবং গবাদিপশুর খাল পার করানোর দৃশ্যের চিত্র (slideshare.net)

ধর্ম:

মিসরীয়দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বল্প সময়ের জন্য 'একেশ্বরবাদে' এ বিশ্বাস করলেও তারা ছিলেন মূলত 'বহুঈশ্বরবাদে' বিশ্বাসী। মিসরীয়দের প্রধান দেবতা ছিল 'রা' বা 'আমন রে'। নীল নদের দেবতা ওসিরিস, মাতৃত্বের দেবী আইসিস প্রভৃতি ছাড়াও অনেক দেব-দেবী রয়েছেন। প্রাচীন মিশরীয়দের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ ছিল 'মৃতের বই' (Book of the Dead)। সমাহিত মৃতদেহের পাশে প্যাপিরাসে লেখা এই ধরনের সাহিত্য নিদর্শন মিলেছে। এই পুস্তকগুলোতে জাদুবিদ্যা, ধর্মীয় শ্লোক ও প্রার্থনা, ঔষধপত্র প্রভৃতির আলোচনা থাকতো।

চুনা পাথরের উপর অঙ্কিত জলহস্তী শিকারের চিত্র, সাক্কারা, মিসর

বর্ষপঞ্জি:

প্রাচীন মিসরবাসী কৃষির প্রয়োজনে প্রথমে চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন ও পরবর্তীকালে সৌরপঞ্জিকার আবিষ্কার ঘটায়।

পিরামিড ও মমি:

প্রাচীন মিসরের অন্যতম স্থাপত্যকীর্তি হলো পিরামিড।

পোশাক–পরিচ্ছদ তৈরি, পরিধান ও ভূমিকাভিনয় :

ছবিতে প্রাচীন মিসরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পোশাক–আশাক লক্ষ করো। তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো (এখান থেকে পড়ে বা অন্য বই পড়ে অথবা ইন্টারনেট ঘেঁটে)। এবারে কাপড়, কাগজ, রং ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রাচীন মিসরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পোশাক, অলংকার ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করে সেগুলো পরে সে সময়কার কোনো কল্পিত ঘটনার অভিনয় করো। এমন একটি ঘটনা তৈরি করবে যেন তা সব শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে।

ফারাও জোসের সময়ে স্থাপত্যশিল্পী ইমহাটেপ সর্বপ্রথম জোসের সমাধিস্থলের ওপর মিসরের পিরামিডটি তৈরি করেন। মিসরের সর্ববৃহৎ পিরামিডটি হলো খুফুর পিরামিড। অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত পিরামিড হলো নেফরা পিরামিড, মেনকুরা পিরামিড, তুতেনখামেনের পিরামিড ইত্যাদি। মিসরের অক্ষত মমিগুলো আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রতি একটি বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এগুলো তৈরির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা শারীরবিদ্যার

জ্ঞান লাভ করেছিল। ফারাওদেরসহ নানা উচ্চশ্রেণির মানুষের শরীর মমি করে বিশেষ পদ্ধতি সংরক্ষণ করে রাখা হতো। এমন কয়েকটি মমি সংরক্ষণ করাসহ ফারাওদের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে জীবিত অবস্থার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিশ্বাস থেকেই পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছিল। পিরামিডে মমির পাশাপাশি আরও নানা ধরনের বস্তু, দেয়াল চিত্র আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র উৎসর্গ করা হতো।

মমি

বিজ্ঞান:

প্রাচীন মিসরে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি ঘটেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিসরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো 'মেটেরিয়া মেডিকা' (Materia Medica)' বা ওষুধের সূচি প্রস্তুতকরণ।

পিরামিডগুলো যখন মিসরের গিজার জনজীবনের অংশ ছিল, তখনকার কাল্পনিক চিত্র। নীল নদ, জনবসতি, মন্দিরসহ নানা স্থাপত্য, স্তম্ভের মতন স্থাপনা (ওবেলিসক) সহ তখন বসতিটি কেমন ছিল তা শিল্পীরা কল্পনা করে এঁকেছেন।

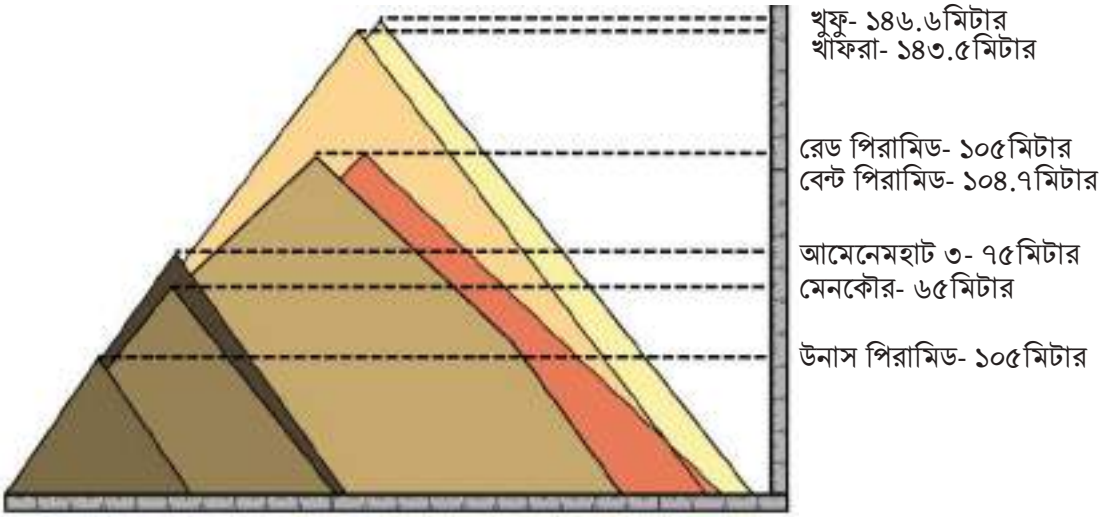

ছোট থেকে বড় পিরামিডগুলোর উচ্চতা আর নাম। ফারাও খুফু ও ফারাও খাফরার স্মরণে তৈরি পিরামিড দুটো সবচেয়ে উঁচু। আর ফারাও উনাসের পিরামিড সবচেয়ে ছোট।

শবদেহ থেকে মমি তৈরি করে কফিনে রাখা বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটতো। কফিনটি মৃতদেহের শ্রেণি ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন উপাদান, অলংকরণ আর ধর্মাচার অনুসারে তৈরি হতো। তারপরে কফিনটি একটি বাক্সে রাখা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাক্সটি পাথরের হতো। এ ধরনের বাক্সকে সারকোফাগাই বলা হয়। বাক্সটিকে কবরের কক্ষে রাখা হতো।

মমি তৈরির পদ্ধতিটি ছবিতে দেয়া আছে। ছবিগুলো দেখে চলো আমরা এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলো লেখার চেষ্টা করি।

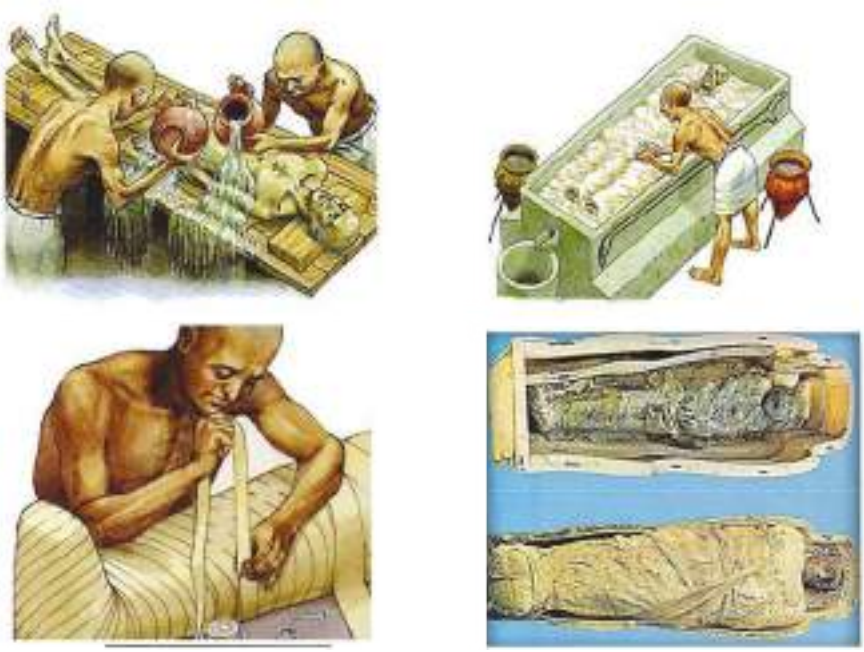

মৃতদেহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর, পরিবর্তন, রাসায়নিক ব্যবহার করে, কাপড়ের পরতে পরতে আবৃত করে কয়েকটি ধাপে অনেক সময় ধরে মমিতে পরিণত করা হতো। উপরের ছবিতে তেমনই কয়েকটি ধাপ গবেষণার মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

মিসরীয় সভ্যতায় কীভাবে মমি তৈরি করা হতো, আর কেনই বা এই মমি এত দিন ধরে টিকে আছে– তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ইতিহাসবিদগণ বিভিন্ন গবেষণা করে চলেছেন। অনেক মমি পাওয়া গেছে। তবে এসব মমির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ফারাও তুতেনখামেন বা রাজা তুতের মমি। তিনি মাত্র ৯ বছর বয়সে ফারাও হন প্রাক সাধারণ ১৪৩৩ অব্দে আর রাজত্ব করেন ১৪২৩ অব্দ পর্যন্ত। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি মৃতুবরণ করেন। গবেষকগণ তার মমি করা দেহের অবশেষ ও কঙ্কাল নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তুতের একটি পা জন্মগতভাবেই বাঁকানো ছিল। তিনি কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে মারা গিয়েছিলেন। এই ছবিতে তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষ থেকে ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত তুতেনখামেনের কফিনের পুরো ছবি আর তার মুখায়ববের কফিনে তৈরি করা চিত্র দেখানো হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ১৯২২ সালে তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষে প্রবেশ করে তার কফিন এবং সমাধিতে উৎসর্গ করা অসংখ্য মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করেন।

বুক অব ডেড বা পরলোকগতদের বইয়ে প্যাপিরাসে চিত্রিত পরলোকে যাত্রার চিত্রাবলি। হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লেখা। (pixels.com)

তুতেনখামেন

তুতেনখামেনের সমাধি কক্ষ ও কফিন।

কাছে কোনো পাথরের উৎস ছিল না। ছিল না কোনো যন্ত্র বা আধুনিক প্রযুক্তি। তারপরেও কীভাবে মিসরীররা পিরামিড তৈরি করেছিলেন? বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে এই জটিল স্থাপত্যগুলো নির্মাণের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। প্রথমে নীল নদের মাধ্যমে জাহাজে বহন করে পাথর নিয়ে আসা হতো পিরামিড তৈরি করার জন্য।

জাহাজ থেকে পাথরের টুকরাগুলো কীভাবে নিয়ে আসা হতো পিরামিড নির্মাণ করার স্থানে? ছবি দেখে তোমরা বলতে পারবে?

জাহাজ থেকে কাঠ বসিয়ে একদিক থেকে নিচ দিয়ে চাপ দিয়ে তুলে ধরে অন্যদিক থেকে দড়ি দিয়ে অনেকে মিলে টেনে পাথরের টুকরাগুলোকে পিরামিড তৈরি করার স্থানের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো।

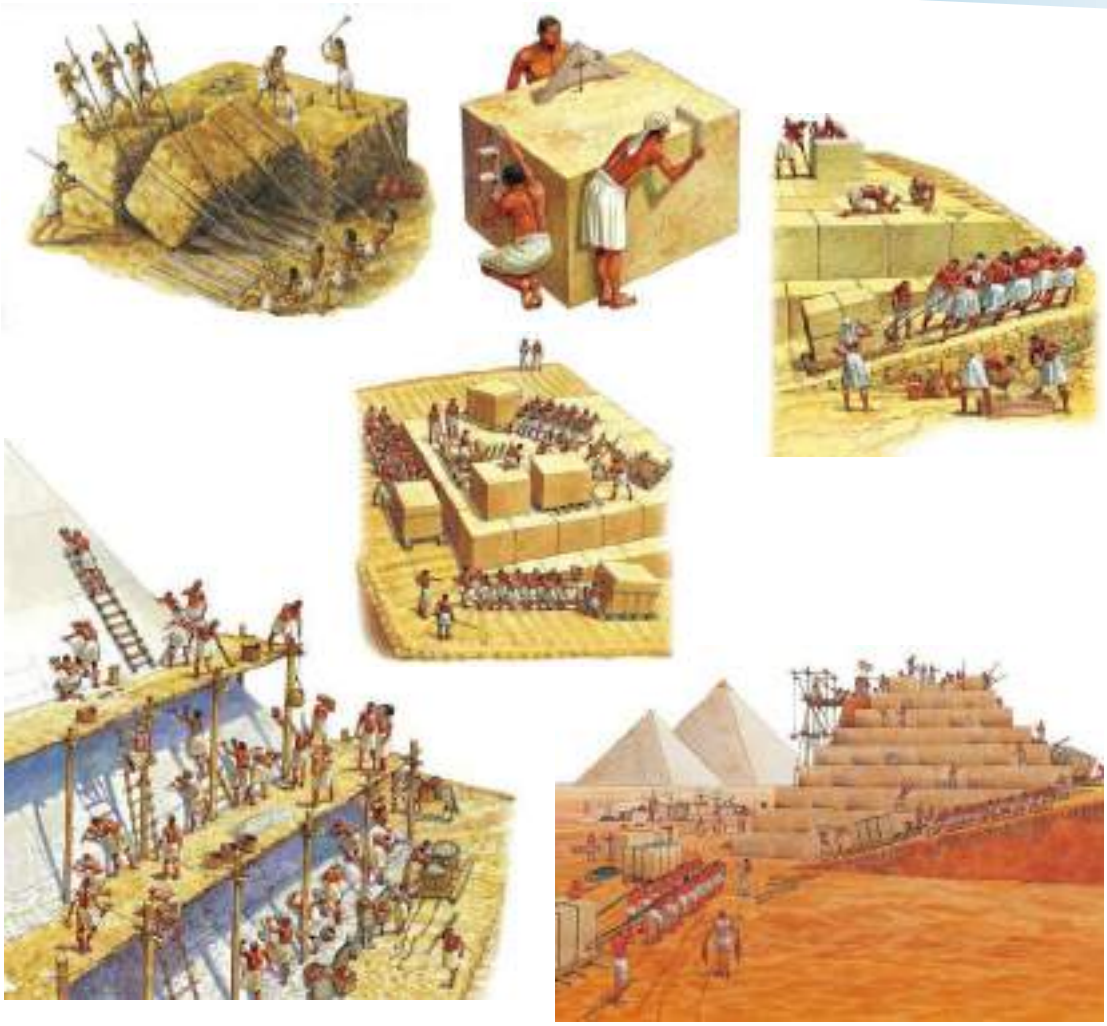

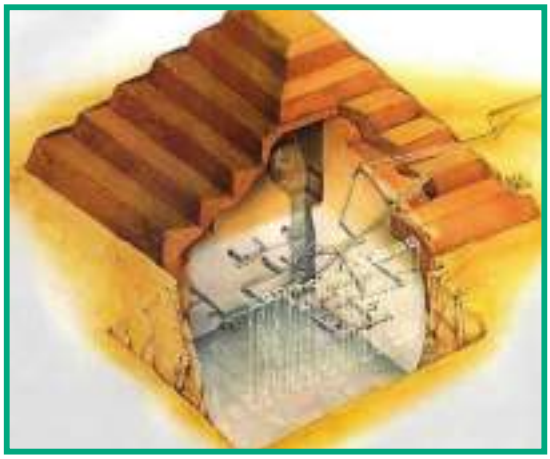

পিরামিডের ভিতরের দেখতে কেমন ছিল।

পিরামিড নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ :
পাথর মেপে, কেটে দরকারী আকার দিয়ে পিরামিড তৈরির উপযোগী করা হত। একটা পাথরের উপরে আরেকটা পাথরের টুকরো বসানো হত। দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে উপরের দিকে পাথরের টুকরাগুলোকে উঠানো হত। একটার উপরে আরেকটা স্থাপন করা হত। পিরামিড তৈরির এই প্রক্রিয়ার প্রচুর শ্রমিক দরকার হত। গবেষকগণ মনে করেন, বড় আকারের একটা পিরামিড তৈরি করতে ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ জন শ্রমিক প্রয়োজন হত। এই শ্রমিকগণের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত নির্মাণ স্থানের কাছে। উপরের ছবি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ কল্পনা করে আঁকা হয়েছে।

বিখ্যাত স্ফিংস ভাস্কর্য, গিজা, মিশর। মিশরীয় সভ্যতার বিভিন্ন ফারাওয়ের শাসনামলে এই ভাস্কর্যের অর্থ পাল্টেছে। স্ফিংকস হলো একটি কাল্পনিক প্রাণী, যার মাথা পুরুষের আর শরীর সিংহের। একে ইহকাল ও পরকালের অভিবাবক মনে করা হত। গিজার এই স্ফিংকস মিশরীয় সভ্যতার সময়েই কয়েকবার বালির নিচে চাপা পড়েছিল। ফারাওগণ খনন করে আবার এই ভাস্কর্য উদ্ধার করেছেন। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করে এই কাল্পনিক প্রাণীটিতে একসময় সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা মনে করা হতো। ফারওগণের সঙ্গে এই ভাস্কর্যকে একই ক্ষমতা আরোপ করা হত। নগরের ও সাম্রাজ্যের রক্ষক হিসেবে আর সূর্যদেবতার একটি রূপ হিসেবেও স্ফিংকস ফারাওদের অলৌকিক ও স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রতীক ছিল।

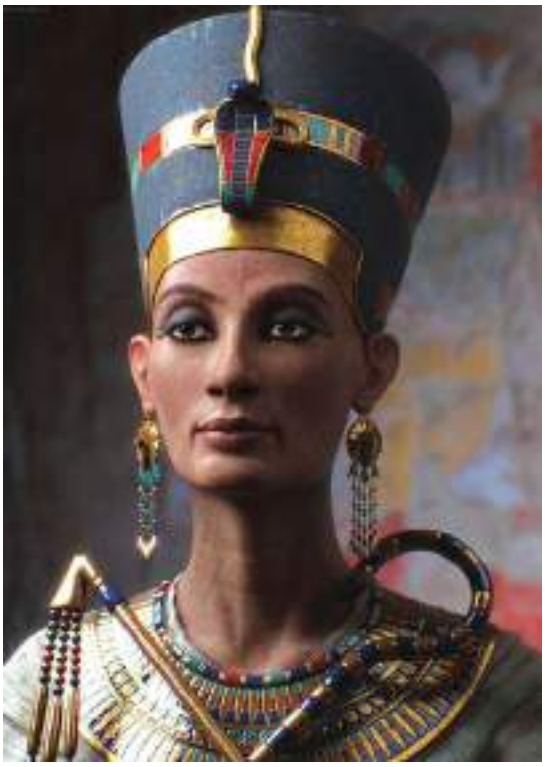

রাজা আখেনাতেন এবং রাণি নেফারতিতি মিসরের জীবনযাপনে বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। নেফারতিতির সমাধি-মন্দির খুব বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন। উপরে বামে নেফারতিতির মুখায়ববের ভাস্কর্য আর ডানে শিল্পীর কল্পনায় নেফারতিতির চেহারার পুনর্গঠিত চিত্র।

নেফারতিতির সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে আঁকা চিত্রে দেখানো হয়েছে, তিনি বসে সেনেট নামের একটা খেলা খেলছেন। অনুমান করা হয়, খেলাটা বর্তমান দাবা খেলার মতন কোনো খেলা ছিল।

মিশরে চাষাবাদ কীভাবে করা হত? ফসল কীভাবে কাটা হত? খেঁজুর গাছ লাগানো হত। লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বীজ বপন করা হচ্ছে। শস্য কাটা হচ্ছে। নিচে খেজুর গাছে খেজুর ধরে আছে। এই ছবিগুলো দেয়ালে আঁকা হয়েছিল তখনকার মিশরে। আমাদের দেশের কৃষিকাজের সঙ্গে প্রায় ৪০০০ বছর আগের মিশরের চাষাবাদের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করতে পারো?

মিসরকে বলা হয় নীল নদের দান। নীল নদের প্রবাহ ও বন্যার কারণে যে বিশাল সমতলভূমি তৈরি হয়েছিল সেই উর্বর জমিতে বিভিন্নভাবে চাষাবাদ করা হতো। এই চাষাবাদই ছিল মিসরীয় সভ্যতা বিকাশের অন্যতম প্রধান প্রভাবক। উপরের ছবিতে লাঙল দিয়ে গরুর মাধ্যমে চাষাবাদ করা, বীজ বপন করার ছবি আছে। নীল নদের কাছে কীভাবে বসতিগুলোর চারপাশে জমি চাষাবাদ করে ফসল ফলানো হতো তার কাল্পনিক ছবি আছে। আরও আছে ছোট ছোট খাল বা নালা তৈরি করে পানি নিয়ে গিয়ে ঝুড়ি বা পাত্রের মাধ্যমে সেচ দেওয়ার চিত্র।

মিসরের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রের মাধ্যমে তৈরি লিখন পদ্ধতি। এই লিপি হায়ারোগ্লিফিক নামে পরিচিত। ইতিহাসবিদগণ এই লিপি পড়তে পারতেন না এই প্রস্তর লিপিটা ছাড়া। পাথরের উপরে খোদাই করা প্রাক সাধারণ ১৯৬ অব্দে রাজা পঞ্চম টমেমি ইপিফানেসের পক্ষ থেকে জারি করা এই আদেশ তিনটি লিপিতে লেখা হয়েছে: হায়ারোগ্লিফিক, ডেমোটিক আর প্রাচীন গ্রিক। একই আদেশ তিন লিপিতে লেখা হয়েছিল বলেই এই পাথরের খণ্ডটি হয়ে উঠেছিল হায়ারোগ্লিফিক পড়ার চাবিকাঠি। মজার বিষয় হলো, এই পাথরের লিপিটি পরে বিভিন্ন স্থাপত্যে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নেপোলিয়নের মিসর দখলের জন্য যুদ্ধে যাত্রার সময় একজন ফরাসী সেনা এই লিপি আবারও খুঁজে পান ১৭৯৯ সালে।

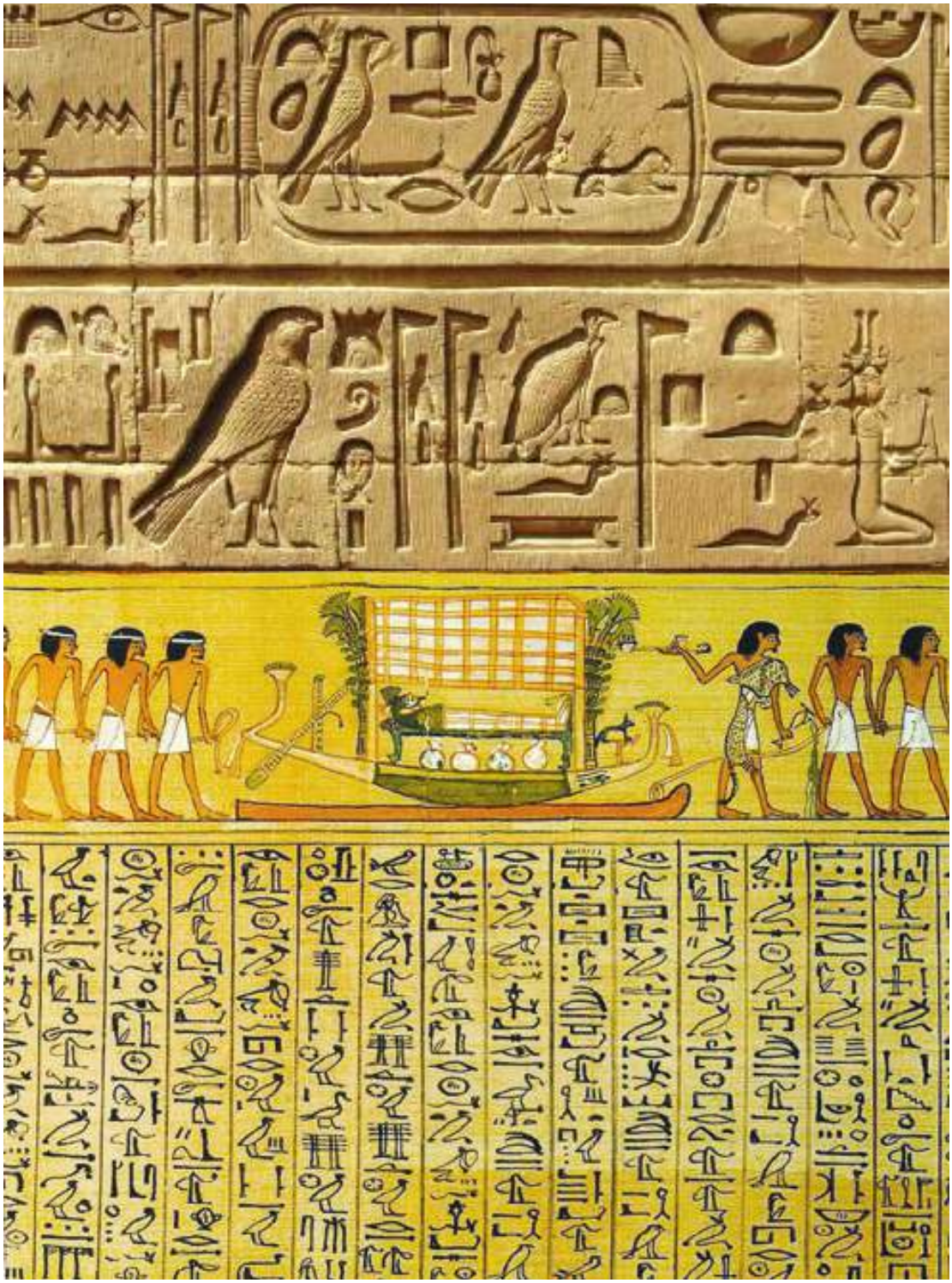

পাথরে খোদাই করা আর প্যাপিরাসে লেখা হায়ারোগ্লিফিক লিপি।

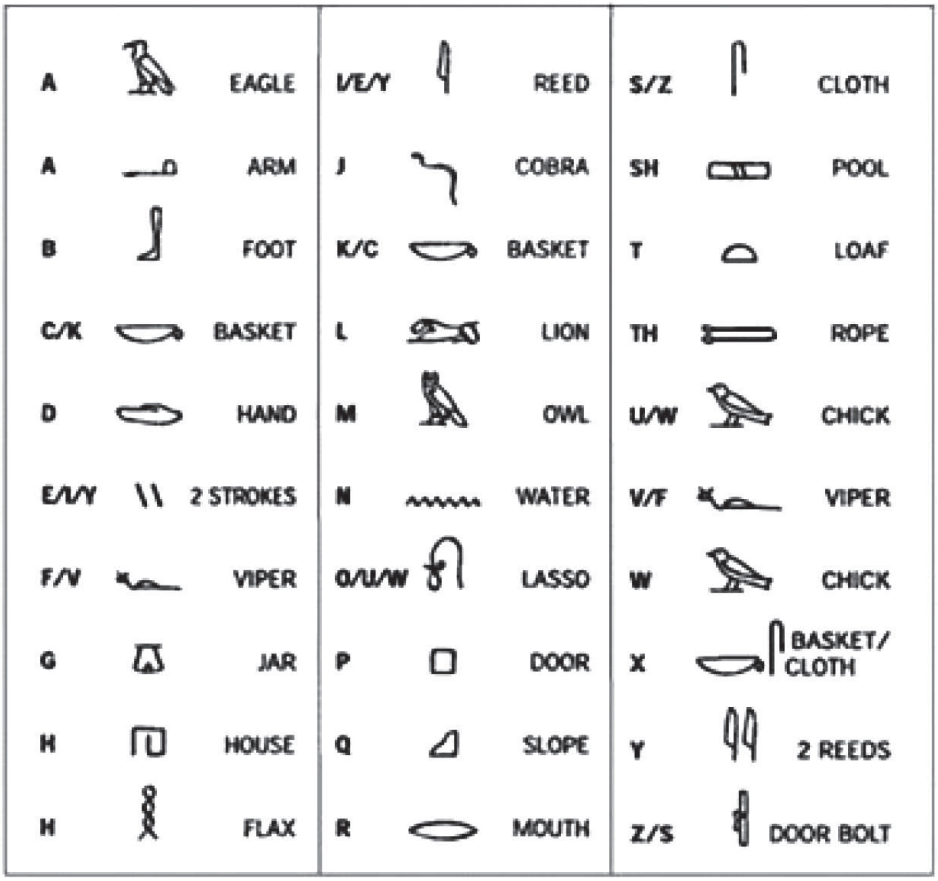

কয়েকটি হায়ারোগ্লিফিক চিত্রলিপির অর্থ দেওয়া হলো ইংরেজিতে। তোমরা খোদাই করা লিপির ছবির সঙ্গে মিলাতে পারো।

মিসরের একধরনের বাড়ি। বিভিন্ন শ্রেণি ও নগরের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গড়নের বাড়িতে বসবাস করতেন। শিল্পী ও কপিরাইট: গুস্তাভ নর্ডগ্রিন (https://www.artstation.com/artwork/JlNzwz)

কারনাক থিবস নগরী-সংলগ্ন একটি নগর-অঞ্চল। কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

খারগা মরূদ্যান সংলগ্ন খারগা নগর। এই মরূদ্যান কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নগরটি সে সময়ের বাণিজ্যপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। (কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন, (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

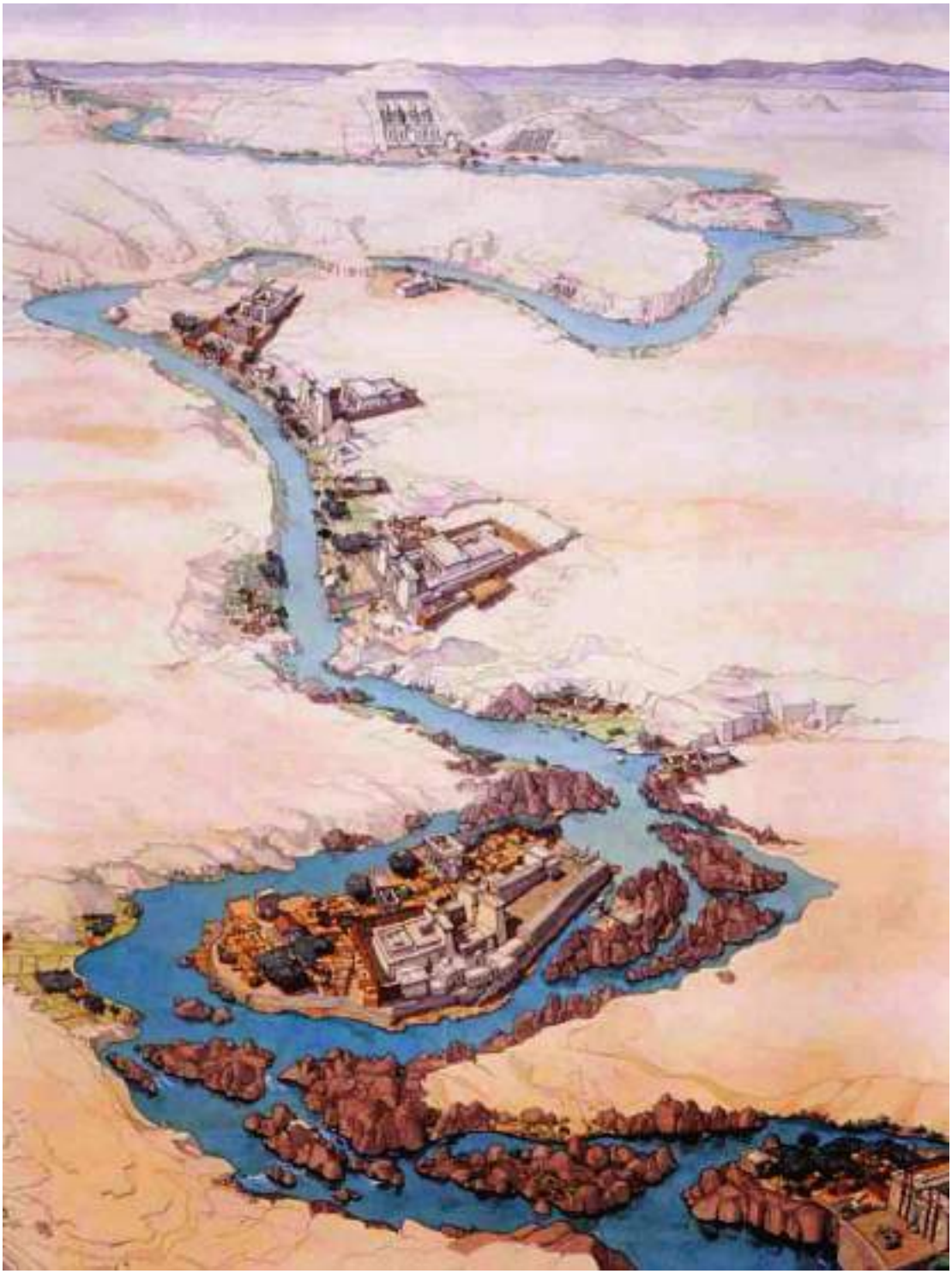

নীল নদের পাড়ে ও মধ্যে গড়ে তোলা থিবস নগর ও সংলগ্ন বিভিন্ন মন্দির ও স্থাপনা কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

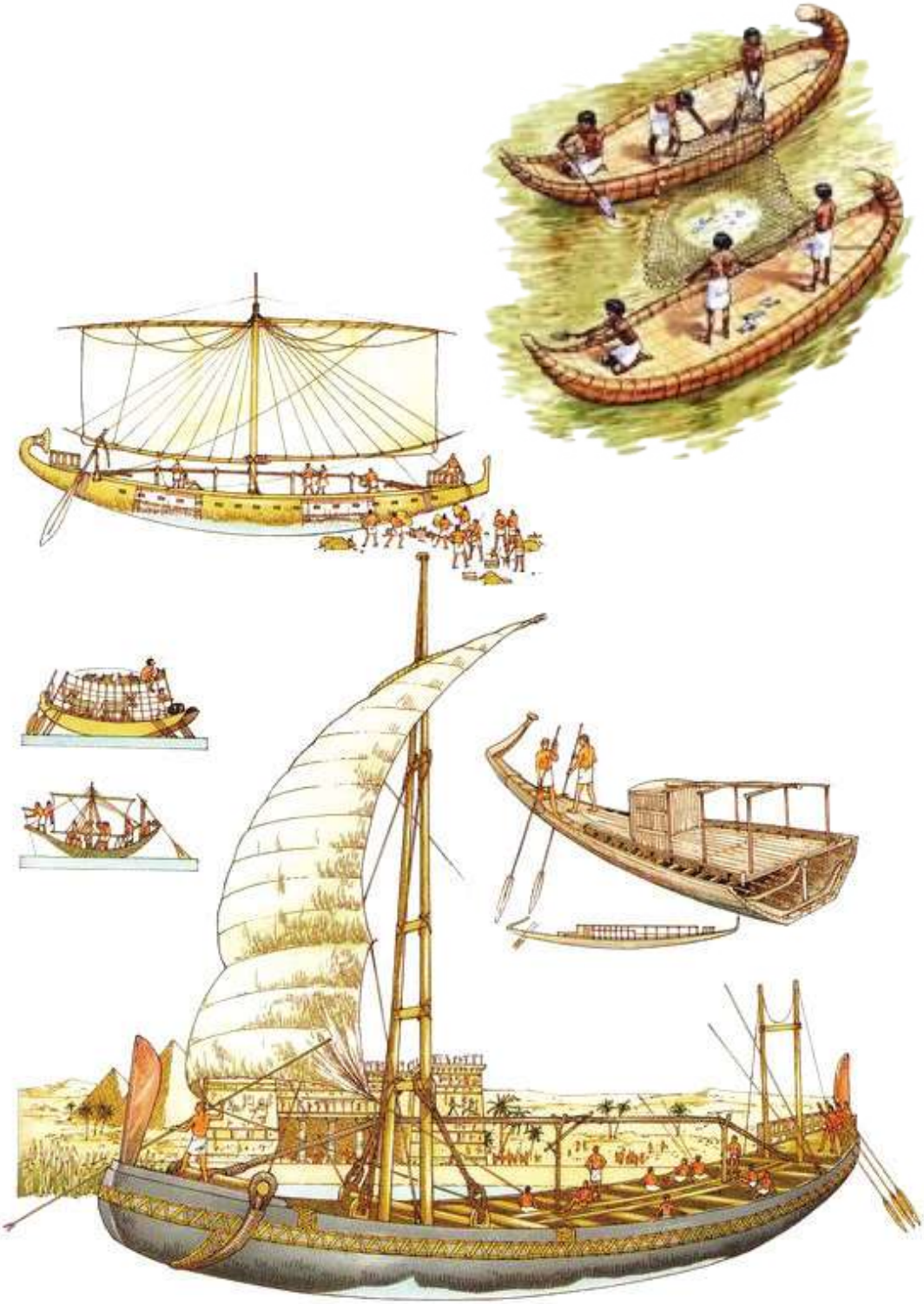

মিসরীয় সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত নৌকা ও জাহাজের ছবি।

লুক্সরের বিখ্যাত মন্দির। কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যাঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

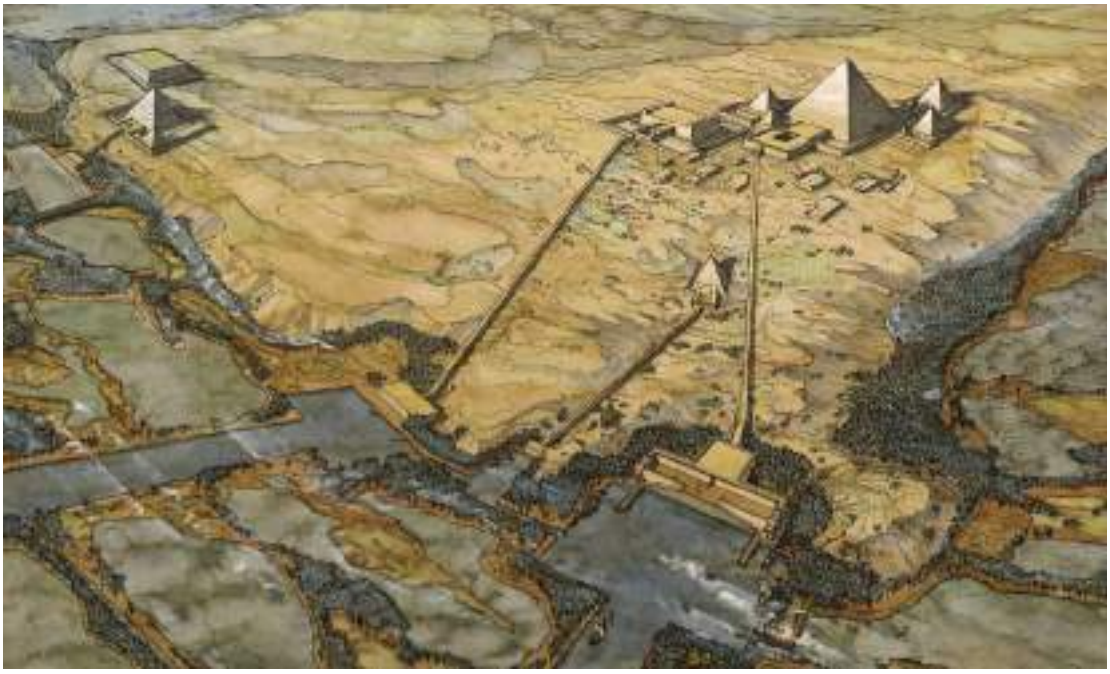

একটা সময়ে গিজার পিরামিডগুলোসহ কেমন দেখা যেতো সেটার কাল্পনিক চিত্র। কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যাঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

মিসরীয় সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত নৌকা ও জাহাজের ছবি।

আবু সিম্বাল মন্দির

আবু সিম্বাল মন্দিরের মধ্যের একটি ছোট মন্দিরের দেয়ালচিত্র

বিখ্যাত রাজাদের উপত্যকা অথবা ভ্যালি অব কিংস-এর সেই সময়ের চেহারা কেমন ছিল? শিল্পীর কল্পনায়। সূত্র ও কপিরাইট: https://www.deviantart.com/ecystudio/art/The-valley-of-the kings-৪৫৪৯৮৬৫৩৪

যদি আমি কখনো মিসর ভ্রমণে যাই:

তোমরা কি কেউ কখনো মিশরে গিয়েছ? কী কী দেখেছ আর কী কী তোমার ভালো লেগেছে এবং কেন তা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কর।

যদি ভবিষ্যতে তোমার কখনো মিসর ভ্রমণের সুযোগ হয়, তাহলে তুমি কোন কোন জায়গায় যেতে চাও? কী কী স্থান পরিদর্শন করতে চাও? কী কী নিদর্শন দেখতে চাও? একটি ইচ্ছার তালিকা তৈরি করে ফেলো তাহলে:

আমি যে শহরগুলোতে যেতে চাই	আমি যে বিশেষ স্থানগুলো পরিদর্শন করতে চাই	আমি যে নিদর্শনগুলো দেখতে চাই	আমি যে কাজ গুলো করতে চাই
থিবস	সিম্বাল মন্দির	মমি	নীল নদে নৌকা বা জাহাজে ভ্রমণ
কারণ :	কারণ :	কারণ : এটি তৈরির প্রক্রিয়াটি আমার কাছে চমকপ্রদ লেগেছে।	কারণ :

তোমার ইচ্ছাগুলো পাশের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে পারো।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা: কয়েকটি সভ্যতার যোগফল

'মেসোপোটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি'। মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৃথিবীর কয়েকটি অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এসেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতার সমন্বয়ে বৃহৎ ভৌগোলিক সীমারেখাকে একই নামে চিহ্নিত করতে গিয়ে সভ্যতাটির নাম দেওয়া হয়েছে মেসোপটেমীয় সভ্যতা। তবে এখন মনে করা হয়, দুই নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকাই কেবল নয়, আরও বড় একটা অঞ্চলজুড়ে একের পর এক সাম্রাজ্য ও নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল বর্তমান ইরাক, কুয়েতসহ দেশগুলোতে এই সভ্যতা বা নগর-রাষ্ট্রগুলোর মিল ছিল তাদের লেখার রীতিতে আর ধর্মীয় মতবাদে, বিশেষ করে দেবতা ও দেবীদের উপরে অংশীদারত্বে। তাই মেসোপটেমীয় সভ্যতাকে কয়েকটি সভ্যতার মিলনও বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন সময়ে একেকটি নগর একেকটি রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করতো। নগরের প্রধান বা শাসকই ওই রাষ্ট্রেরও প্রধান ছিলেন। প্রতিটি নগরের কেন্দ্রে ছিল একটি মন্দির। একেকটি নগরের প্রধান দেবতার প্রতি নিবেদিত এই মন্দিরগুলোকে বলা হতো জিগুরাত। এই মন্দিরকে ঘিরেই পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, দুর্গ, সাধারণ মানুষের বসবাসের স্থাপনাসহ আরও নানা ধরনের স্থাপত্য নির্মিত হতো। মেসোপটেমীয় সভ্যতার নগর-রাষ্ট্রগুলোতে ইতিহাসে ঘটা প্রথমবারের মতো ঘটনা ঘটেছিল। যেমন: প্রথম লিখিত আইনি দণ্ডবিধি, প্রথম আইন প্রণয়নকারী সভা ছিল, নারীদের প্রথম সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদের, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ও ব্যবসায়িক চুক্তি করার, প্রথম চিকিৎসা বিধি রচিত হয়েছিল, প্রথম কৃষিকাজের বিবরণী, প্রথম সাহিত্যিক বিতর্ক, প্রথম পেশাগত চাকরির ধারণা ইত্যাদি।

এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপোটেমীয় সভ্যতা, আধুনিক ইরাক, ইরান, কুয়েত, তুরস্ক, সিরিয়া জুড়ে এই সভ্যতাগুলোর নগর ও বসতিগুলো গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতাগুলো উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূমিতে; যে ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরব মরুভূমি এবং পূর্বে জাগরাস পার্বত্যাঞ্চল রয়েছে।

> পার্বত্যাঞ্চল হলো পার্বত্য এলাকা। বৈশিষ্ট্যগতভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যথেষ্ট উচ্চতাসম্পন্ন, বন্ধুর এবং অতি স্বল্প পরিমাণের সমতল অথবা নিম্ন ঢাল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। স্থানীয় বন্ধুরতা প্রায় ৬৫০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে, বিশ্বের প্রায় এক শতাংশ এলাকা নিম্ন ঢাল বিশিষ্ট পার্বত্য অঞ্চল এবং প্রায় ২৭ শতাংশ এলাকা পর্বতময়।

এখানে যে লেখার রীতির প্রচলন ঘটেছিল সেই রীতি কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। পাথরে, পোড়ামাটির খণ্ডে এসব লেখার প্রমাণ বিভিন্ন নগরগুলো খনন করে পাওয়া গেছে। এই লিখনশৈলীতে কবিতা ও মহাকাব্য (যেমন: গিলগামেশের মহাকাব্য) লিখিত হয়েছিল। অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতার মতনই এই সভ্যতা বিকশিত হওয়ারও প্রধান ভিত্তি ছিল দজলা ও ফোরাত নদীর উর্বর অববাহিকায় কৃষিকাজের বিকাশ এবং উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন। পাশাপাশি, সমুদ্রপথে মিসরীয় সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র আর হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গেও এই সভ্যতাগুলোর কেন্দ্রগুলোর স্থল ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

বিভিন্ন সভ্যতার সময়কাল

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অধীনে মেসোপোটেমিয়ার অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। সেই সভ্যতাগুলোর নাম, সময়কাল আর প্রধান নগর-রাষ্ট্রের নামে নিচের সারণিতে পাবে:

সময়কাল	জাতিগোষ্ঠী	আবাসস্থল	প্রধান নগর
খ্রি. পূ.৩২০০-খ্রি. পূ.২৩২০	সুমের	উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলামের পর্বতমালা	উর
খ্রি পূ.২৩২০-খ্রি. পূ.২১৩০	আক্কাদীয়	সুমেরের উত্তরে আক্কাদ অঞ্চলে (সেমেটিক ভাষী যাযাবর গোষ্ঠী)	আক্কাদ
খ্রি. পূ.২১৩০-খ্রি. পূ.২০০০	সুমের	উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলামের পর্বতমালা	উর
খ্রি. পূ.২০০০	ইলামাইট	পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি	উর
খ্রি. পূ.১৮০০-খ্রি. পূ.১৬০০	অ্যামোরাইট (সেমেটিক ভাষী যাযাবর গোষ্ঠী)	আরব মরুভূমি	ব্যাবিলন
খ্রি. পূ.১৬০০-খ্রি. পূ.১৩০০	ক্যাসাইট ও হিট্রাইট	এশিয়া মাইনর ও আনাতোলিয়া	
খ্রি. পূ.১৩০০-খ্রি. পূ.৬১২	এসেরীয়	টাইগ্রিসের উচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র মালভূমি	আসুর ও নিনেভ
খ্রি. পূ.৬১২-খ্রি. পূ.৫৩৮	ক্যালডীয় (সেমেটিক ভাষী যাযাবর গোষ্ঠী)	দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল	আসুর ও নিনেভ

সুমেরীয় সভ্যতা

মেসোপোটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিল সুমেরীয় জাতি। তাদের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল লাগাস, কিস, ইরিদু এবং উরুক। বিখ্যাত শাসক সারগন সুমেরের নগররাষ্ট্রগুলোকে একত্র করেন। পরবর্তীকালের অপর বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট 'ডুঙি'; যিনি সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন সংকলন করেছিলেন।

সামাজিক শ্রেণি ও বিশ্বাস

সুমেরীয়দের সমাজের প্রথম স্তরে ছিল শাসক ও ধর্মযাজক, দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ নাগরিক এবং তৃতীয় স্তরে ক্রীতদাস সম্প্রদায়। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল নার্গাল। এ ছাড়া সূর্যদেবতা শামাশ, বৃষ্টি ও বায়ুর দেবতা এনলিল এবং নারী জাতির দেবী 'ইশতা' নামে পরিচিত ছিলেন।

সুমেরীয় সভ্যতার বিভিন্ন আবিষ্কার ও সৃষ্টি

প্রাক সাধারণ অব্দ ২০০০ এ সুমেরীয়রা 'গিলগামেশ' নামক মহাকাব্যটি রচনা করেন। ৩০০০ প্রাক সাধারণ অব্দে সর্বপ্রথম সুমেরীয়রা কিউনিফর্ম নামক লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন। কাদামাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাঙ্কন করে মনোভাব প্রকাশ করা হতো। সুমেরীয়রাই প্রথম চাকাচালিত যানবাহনের প্রচলন করেন। তাদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি ছিল 'জিগগুরাত' নামের ধর্মমন্দির।

কীলকাকার লিখন পদ্ধতির নাম কিউনিফর্ম

কিউনিফর্ম লিপির রূপান্তর। তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে বিভিন্ন শব্দ বোঝানোর জন্য কীভাবে লেখা হতো। তোমরা নিজেরা এই হরফে কাদার উপরে একটা কাঠি দিয়ে লিখে সেটা শুকিয়ে নিতে পারো। বা পুড়িয়ে শক্ত করে নিতে পারো।

পূর্ণ বিকশিত কিউনিফর্ম লিপি (etsy.com)

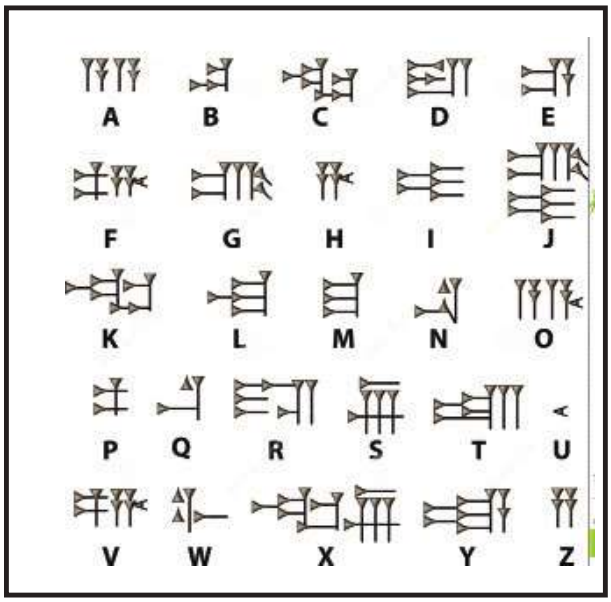

ইংরেজি বর্ণমালার অনুসারে কিউনিফর্ম লিপি

ব্যবিলনীয় সভ্যতা

ব্যবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অ্যামোরাইট নামের সেমিটিক জাতি। ব্যবিলন এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী নগরে পরিণত হয়েছিল। সেমেটিক জাতির বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবি পৃথিবীর প্রথম আইনপ্রণেতা হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ফ্রান্সের লুভ্যর জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি স্তম্ভে ২৮২টি আইন উৎকীর্ণ করা আছে। ব্যবিলনীয় সভ্যতায় 'মারদুক' নামের সূর্যদেবতার পূজা অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া প্রণয়ের দেবী ইশতার, বায়ুর দেবতা মারুওসসহ অসংখ্য দেবদেবীর পূজা তারা করতেন। তারাই মাসকে ৩০ দিনে, সপ্তাহকে ৭ দিন ও দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেন। বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত ও শিল্পকলায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

আসিরীয় সভ্যতা:

হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর সেমেটিক জাতি আসুর ও নিনেভে বসবাস শুরু করার ফলে নগর দুটি প্রধান নগরে পরিণত হয়। এরাই সময়ের পরিক্রমায় এসেরীয় নামে পরিচিতি লাভ করে।

এসেরীয় সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা তৃতীয় তিগলাথপিলবার প্রথম প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তন করেন। সেনাচেরির সময়ে সমগ্র উর্বর চন্দ্রাকৃতি ভূমি বিজিত হয় এবং তিনি নিনেভকে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেন। তবে মিসর অভিযানে তিনি ব্যর্থ হলেও তার পৌত্র আসুরবানিপাল মিসর দখল করেন। আসুরবানিপাল এশিয়ার প্রথম গ্রন্থাগারটি নিনেভে প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ২২০০০টির বেশি কাদামাটির চাকতির পুস্তক ছিল।

ক্যালডীয় সভ্যতা :

প্রাক সাধারণ অব্দ ৬১২ অব্দে এসেরীয়দের পতন ঘটলে নেবোপালসারের নেতৃত্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ও সভ্যতা গড়ে ওঠে, যেটি ক্যালডীয় বা নব্য ব্যাবলনীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। হাম্মুরাবির পর নিকট প্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন নেবোপালসারের পুত্র নেবুচাদনেজার। ব্যাবিলন শহরে ১০০ ফুট উঁচু ৫৬ মাইল দেয়াল এবং শহরের মধ্যবর্তী স্থানে দেবী ইশতারের স্মরণে ইশতার তোরণ ও সঙ্গে মিছিল সড়ক নির্মিত হয়েছিল। দেবতা মারদুকের নামে উৎসর্গকৃত জিগগুরাত মন্দিরটি তার উচ্চতার কারণে 'টাওয়ার অব ব্যাবেল' নামে পরিচিত। নেবুচাদনেজার তার রানীর সন্তুষ্টির জন্য নগর দেয়ালের উপর 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে অভিহিত একটি উদ্যান নির্মাণ করেন। এই অপূর্ব কীর্তি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য নামে খ্যাত।

পৃথিবীর ইতিহাসের মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার পরবর্তী প্রায় সকল সভ্যতাই শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। তাই বিশ্বসভ্যতায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

সভ্যতাগুলোর সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা

লিখিত বিভিন্ন সূত্র থাকায় এখানকার রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষজন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। অনেক সময় নগরগুলো সার্বভৌম ছিল। লিখিত আইন ও দণ্ডবিধি প্রণীত হতো প্রধান শাসক ও প্রধান মন্দিরের পুরোহিতসহ বিভিন্ন মানুষের একটি সমষ্টির মাধ্যমে। আইনের ক্ষেত্রে সাবালক ও নাবালকের ভেদ ছিল। তবে রাজার ভূমিকাই মুখ্য ছিল। বিভিন্ন ধরনের পেশায় নাগরিকগণ যুক্ত ছিলেন। সমাজে উচ্চনীচ ভেদাভেদ আর নানা ধরনের পেশার মানুষজনের উপস্থিতির কারণে ভেদাভেদ ও বৈষম্য অন্যান্য সভ্যতার নগর ও বসতির মানুষজনের মতনই ছিল। প্রথম দিকে পুরোহিতগণের প্রাধান্য শাসনের ক্ষেত্রে থাকলেও পরে রাজা বা প্রধান শাসক সবচেয়ে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। মেসোপটেমীয়াতেই প্রথম রথ বা ঘোড়া চালিত চাকার বাহনের প্রমাণ

মেলে। কৃষিকাজ ও আবাদ করা প্রধান পেশা হলেও কারিগর, পুরোহিত, শিক্ষক, চিকিৎসক, চর্মকার ইত্যাদি পেশা ছিল।

নিচের ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করে গ্রীক মেসোপটেমীয় সভ্যতার মূল সাতটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করি:

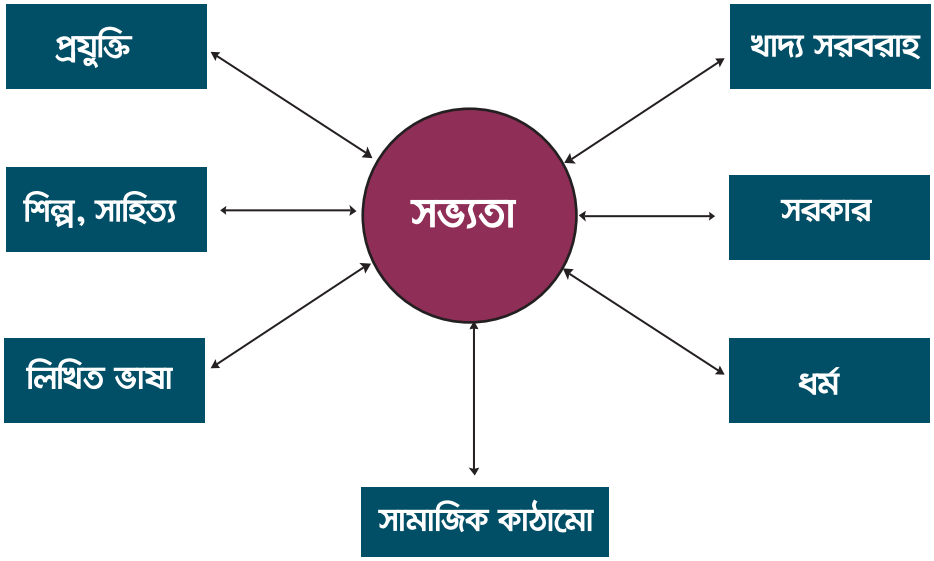

বিতর্ক: "মিসরীয় সভতা মেসোপোটেমীয় সভ্যতার চেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিল"
দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরি। বন্ধুরা আর খুশি আপা হবেন বিচারক।
এর পক্ষে আর বিপক্ষে যুক্তি গুলো পয়েন্ট আকারে লিখে রাখিঃ

পক্ষে যুক্তি	বিপক্ষে যুক্তি

গুরুত্বপূর্ণ ও মজার তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তৈরি:

মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার কত গুরুত্বপূর্ণ আর মজার মজার বিষয় আমরা পড়লাম। এবারে আমরা এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার প্রতিটির জন্য পাঁচটি করে প্রশ্ন তৈরি করি, যে প্রশ্নের উত্তর এক শব্দে বা এক কথায় দেওয়া যায়। উত্তরগুলোও চিহ্নিত করি আর লিখে রাখি। তোমার পাশের বন্ধুও নিশ্চয়ই এ রকম কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছে। দুজন দুইজনের তৈরি করা প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। দেখি তা কে কয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি। ভুল হলে বই দেখে নেই বন্ধুর সঙ্গে মিলে।

সুমেরীয় সভ্যতা	কোন শাসক সুমেরীয় নগর রাষ্ট্রগুলোকে একত্রি করেন? উত্তর: সারগম সুমেরের সারগন সুমেরর বিভিন্ন নগরকেন্দ্রগুলোকে একত্র করেন।
ব্যাবলনীয় সভ্যতা	
আসিরীয় সভ্যতা	
ক্যালডীয় সভ্যতা	

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা ও ফোরাত) নদী বিধৌত উর্বর অববাহিকায় একের পরে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতাগুলো মিলেই মেসোপটেমীয় সভ্যতা। মানচিত্রটিতে মেসোপটেমীয় সভ্যতায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্রের অবস্থানও দেখানো হয়েছে। (https://www.ancient-civilizations.com/mesopotamian-civilization/)

মেসোপটেমীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র ও বিস্তৃতি (সূত্র ও কপিরাইট: https://kmjantz.wordpress.com/২০১৩/০৪/২৫/early-civilizations/)

সুমেরীয়দের প্রতিটি নগরকেন্দ্রে একটি নগরদেবতার নামে উৎসর্গ করা মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলোকে জিগুরাত বলা হতো। উর নগরের জিগুরাতটি তখন দেখতে কেমন ছিল? সেই মন্দিরের দুটো কাল্পনিক ছবি। কপিরাইট : জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/project/middle-east/

উর থেকে প্রাপ্ত চিত্রে অঙ্কিত যানবাহনে চাকার ব্যবহার
For Video https://www.khanacademy.org/humanities/history/ancient-medieval/Ancient/v/standard-of-ur-c-২৬০০-২৪০০-b-c-e

সুমেরীয় সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত কাদামাটির ট্যাবলেটে বার্লি ও গমের উল্লেখ পাওয়া যায়

আক্কাদীয় রাজা সারগন (বামে); নব্য-আসিরীয় রাজা দ্বিতীয় শালমানাসেরের (ডানে) প্রতিকৃতি।

এই পাথরে খোদিতলিপি ও ভাস্কর্যটি পৃথিবীর প্রথমদিকের দণ্ডবিধিগুলোর (অপরাধের শাস্তির আইন) মধ্যে একটি। ব্যাবিলনীয় রাজবংশের রাজা হাম্বুরাবি (আনু. প্রাক সাধারণ ১৭৯২ অব্দ থেকে ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন) এই দণ্ডবিধিটি জারি করেন। উপরের ভাস্কর্যটিতে হাম্বুরাবি দাঁড়ানো অবস্থায় ন্যায়বিচারের দেবতা শামাশ (বা মারডুকের) কাছ থেকে রাজকীয় প্রতীক গ্রহণ করছেন। নিচে আইনের প্রতিটি বিধি লিখিত রয়েছে কিউনিফরম হরফে। বিভিন্ন অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির কথা এখানে লেখা রয়েছে।

রাজা আসুরবানিপালের সিংহ শিকারের দৃশ্য

এখন ব্যাবিলন নগরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। খনন করে ব্যবিলন নগরের ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্থাপনাগুলোর কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ মিলে অনুমান করার চেষ্টা করেছেন সেই নগরটি দেখতে কেমন ছিল। (uruk-uarka.dk)

ব্যবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানকে প্রাচীন পৃথিবীর সাতটি বিস্ময়ের একটি হিসেবে বিভিন্ন লিখিত উৎসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই উদ্যানের কোনো বস্তুগত প্রমাণ ব্যাবিলন নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া যায় নি। অনেকেই মনে করেন, সমকালীন আরেকটি নগর নিনেভে রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যে উদ্যানের কথা দেয়াল চিত্রে পাওয়া যায়, সেই উদ্যানই পরে জনমুখে ব্যাবিলনে অবস্থিত বলে ভুল করা হয়েছে। শিল্পীর কল্পনায় এই উদ্যান বা বাগান এমন ধাপে (uruk-uarka.dk)

ব্যাবিল নগরে প্রবেশ করার প্রধান তোরণ। এই তোরণ ইশতার গেইট বা ইশতার তোরণ নামেও পরিচিত। বিভিন্ন বিশ্লেষণের পরে শিল্পীগণ কল্পনা করে এই চিত্র এঁকেছেন। (uruk-uarka.dk)

আরেকটি নগর-রাষ্ট্র নিনেভের একটি দিকের কাল্পনিক চিত্র। দেখা যাচ্ছে নগরের জিগুরাত, রাজা আসুরবানিপলের প্রাসাদ আর রাজার তৈরি করা পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থাগার।

মেসোপটেমীয়দের চোখে পৃথিবীর ম্যাপ
ও বর্ণনা এই কাদার ট্যাবলেটে খোদাই করা।
(uruk-uarka.dk)

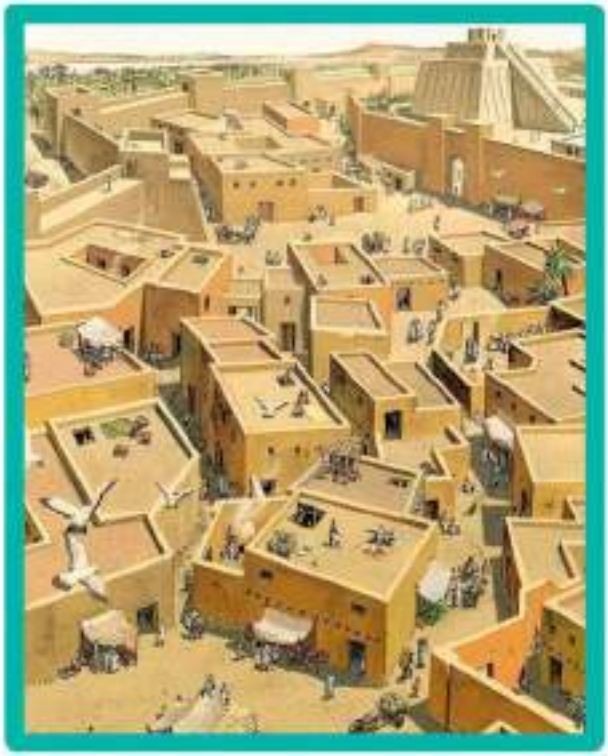

উর নগরের সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি এমনই
ছিল বলে ধারণা করেছেন ইতিহাসবিদগণ।
এখন ছড়িয়ে আছে একসময়ের বিরাট উর
নগরের ধবংসাবশেষ।

মেসোপটেমিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নগর-রাষ্ট্র
উর দেখতে এমন ছিল। ইতিহাসবিদগণ পুনর্গঠন
করেছেন বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে।

উরুক নামের আরেকটি নগর-রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে নগরের বসতির একটি অংশের পুনর্নির্মাণ করেছেন ইতিহাসবিদ ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা মিলে। সূত্র ও কপিরাইট: https://www.researchgate.net/publication/২৮০১৩৪৪৯১_City_of_Uruk_৩০০০_BC_Using_genetic_algorithms_dynamic_planning_and_crowd_simulation_to_re-enact_everyday_life_of_ancient_Sumerians_-_Best_Poster_Award

মেসোপটেমীয় সমুদ্রগামী একধরনের নৌকা।

মেসোপটেমীয় সমুদ্রগামী নৌকা বা জাহাজের আরেকটি ধরন।

গ্রিক সভ্যতা: সমুদ্রনির্ভর বিভিন্ন নগররাষ্ট্র

গ্রিসের মহাকবি হোমার রচিত 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যের উল্লিখিত চমকপ্রদ কাহিনির সূত্র ধরে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ট্রয় নগরীসহ ১০০ নগরীর ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পান। ক্রিট দ্বীপের মিনীয় ও গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলের মাইসেনীয় সভ্যতা; এ দুটি সভ্যতাকে একত্রে ইজিয়ান সভ্যতা বলা হয়। এই ইজিয়ান সভ্যতার উন্নয়নের ফল হিসেবে গ্রিস সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যে কারণে ইজিয়ান সভ্যতার অপর নাম প্রাক্-ক্লাসিক্যাল বা আদি গ্রিক সভ্যতা গ্রিকসভ্যতা। অন্যান্য সকল সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক হলেও গ্রিক সভ্যতায় সাগরের অবদান লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন গ্রিসের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো পর্বত, সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপমালা।

মূলত গ্রিস সভ্যতা ছিল অনেকগুলো দ্বীপরাষ্ট্রর সমন্বয়। এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সময়

পর্বত

পর্বত বলতে আমরা ভূপৃষ্ঠের এমন একটি অবস্থানকে বুঝি যার উচ্চতা অধিক এবং যা খাড়া ঢালবিশিষ্ট। সাধারণত ১০০০ মিটারের অধিক উচ্চতার বিশিষ্ট ভূমিরূপগুলোকে পর্বত বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। যেমন কিলিমানজারো ও হিমালয় পর্বতমালা।

কীভাবে পর্বতমালা গঠিত হয়?

কিছু পর্বত আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দ্বারা গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরির পর্বতগুলো পৃথিবীর গভীরে গলে যাওয়া শিলা দিয়ে তৈরি। পাথরটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূত্বকের মধ্য দিয়ে উঠেছিল। তারপর এটি লাভা আকারে পৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত হয়। লাভা ও আগ্নেয়গিরির ধূলিকণা মিলে পর্বত গঠিত হয়। আগ্নেয়গিরির পর্বতগুলো সাধারণত খাড়া এবং মোচার মতো আকৃতির হয়। জাপানের মাউন্ট ফুজি, আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট রেইনিয়র আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ।

অন্য পর্বতগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূত্বকের মধ্যে চলাচলের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। প্লেট টেকটোনিক্স নামে একটি তত্ত্ব আছে যা বিশদভাবে তোমরা পরের শ্রেণিতে জানবে , এই তত্ত্ব এই ধরনের পর্বতে গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। সংক্ষেপে যদি বলা হয়, তাহলে পৃথিবীর পৃষ্ঠটি অনেকগুলো প্লেট নামক বিশাল অংশে বিভক্ত, যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা গলিত শিলার উপরে ভেসে থাকে এবং খুব ধীরে ধীরে চলে। মহাদেশগুলো প্লেটের উপরের অংশে থাকে এবং সেগুলোর সঙ্গে চলে। অনেক সময় প্লেটগুলোর সংঘর্ষ হয়, তখন ভূপৃষ্ঠ উপরের দিকে উঠে যায়, আর এই উঁচু হয়ে যাওয়া অংশকে আমরা বলি পর্বত। এশিয়ার হিমালয় এই ধরনের পর্বতের উদাহরণ। ভারত বহনকারী একটি প্লেট এর সঙ্গে এশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে এগুলো তৈরি হয়েছিল।

সংঘাতে যেমন লিপ্ত হয়েছে, তেমনি আবার সংঘবদ্ধ হয়েও নানা কাজ করেছে। যে কারণে এ সভ্যতায় ছোট ছোট নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। গ্রিসের তিন দিক অ্যাড্রিয়াটিক, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে নদীগুলো খালের মতো অপ্রশস্ত, অগভীর ও অনাব্য, যে জন্য এখানকার ভূমি উর্বর ছিল না। এ কারণে গ্রিসে গড়ে ওঠা সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক না হয়ে সাগরকেন্দ্রিক সভ্যতা হিসেবে বিকশিত হয়েছে।

আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১২০০ প্রাক সাধারণ অব্দ থেকে সূচিত হয়ে প্রাক সাধারণ অব্দ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে গ্রিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পর্বতময় গ্রিস দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধান শহর ছিল এথেন্স। সেখানেই প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসের ছোট নগর রাষ্ট্রগুলোকে বলা হতো পলিস। পেলোপনেসাসের স্পার্টা নগররাষ্ট্রটি সমরতন্ত্র দ্বারা বা যুদ্ধকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেবার নীতি প্রভাবিত ছিল। গ্রিক নগররাষ্ট্রের দুর্গ সুরক্ষিত অঞ্চলকে বলা হতো অ্যাক্রোপলিস। আর কর্মচঞ্চল এলাকাকে বলা হতো অ্যাগোরা।

সামাজিক অবস্থা

গ্রিক সমাজ ছিল শ্রেণি বিভক্ত। সমাজের উচ্চতর স্তরে ছিল অভিজাত শ্রেণি এবং অপর শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণি ছিল দাস ও শ্রমিকগণ। অভিজাতগণ ছিল অগাধ সম্পত্তির মালিক ও প্রশাসনের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা ছিল সবচেয়ে সুবিধাবাদী। গ্রিক সমাজে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল বণিক গোষ্ঠী।। হেলেনিস্টিক যুগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হলেও তা কেবল শাসক ও বণিকসহ অভিজাত শ্রেণি ভোগ করেছে। অপর দিকে কায়িক শ্রমের কাজগুলো করেছে ক্রীতদাসেরা।

প্রাচীন গ্রিকদের ঘরবাড়ি কেমন ছিল?

গ্রিকদের ঘরবাড়িগুলো একটি বড় উঠানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। এই উঠানই ছিল তাদের নানান কার্যা কলাপের কেন্দ্রবিন্দু। সাধারণত উঠানে জল সরবরাহের একটি কূপ, দেবতাদের উপাসনা করার জন্য একটি বেদি, বাচ্চাদের খেলাধুলার উপযোগী একটি জায়গা ছিল। উঠানের চারপাশে থাকা ঘরগুলো ছিল কাজের ঘর, স্টোররুম, শয়নকক্ষ ইত্যাদি। অধিকাংশ বাড়িতে 'অ্যান্ড্রন' নামে একটি ঘর ছিল, যেখানে বাড়ির পুরুষেরা আড্ডা দিতো এবং তাদের বন্ধু ও ব্যবসায়িক সহযোগীদের সময় দিতো।

কৃষি ও বাণিজ্য

কৃষি ও বাণিজ্য ছিল গ্রিক অর্থনীতির মূলভিত্তি। অধিকাংশ ভূমি পার্বত্যময় ও অনুর্বর হওয়ায় খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। সাধারণভাবে কৃষক ছিলেন দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। গম ও যব ছিল প্রধান কৃষিপণ্য। গ্রিসের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল অভিজাত ও বণিকদের হাতে।

ধর্মীয় বিশ্বাস

প্রাচীন গ্রিকরা ছিলেন মূলত প্রকৃতি পূজারি ও বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। গ্রিসবাসীদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস। তবে তাদের প্রতিটি নগর ও অঞ্চলের নিজস্ব দেবতা ছিল। জিউস কখনো আকাশের দেবতা, আবার কখনো বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধের দেবতা ছিলেন আরাস। সূর্যদেবতা ছিলেন অ্যাপোলো, পসিডন ছিলেন সমুদ্রের দেবতা। জ্ঞান ও বায়ুর দেবী ছিলেন চিরকুমারী এথেনা।

স্থাপত্য

জ্ঞানের দেবী এথেনার উদ্দেশে হেলেনেস্টিক সময়ে বিখ্যাত পার্থেনন মন্দির নির্মিত হয়। গ্রিক সভ্যতায় হেলেনীয় যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। গ্রিসের সবচেয়ে খ্যাতিমান ভাস্কর ফিদিয়াসের ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দেবী এথিনার মূর্তি ইতিহাসের দুর্লভ সংযোজন। এথেন্সের এক্সোপলিসে গ্রিক সভ্যতার সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ ও বড় বড় স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ যে কারও চিত্ত আকর্ষণ করে। ডোরীয়, আয়োনীয় ও কোরেন্থীয় রীতির স্তম্ভ বর্তমানেও অনুসরণ করা হয়।

দর্শন, খেলাধুলা ও সাহিত্য চর্চা

জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, খেলাধুলা, সাহিত্য চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রিকদের বিশাল অবদান রয়েছে। ইতিহাসের জনক খ্যাত হেরোডটাস গ্রিস ও পারস্যের যুদ্ধ নিয়ে ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রথম বই রচনা করেন। গ্রিক সভ্যতায় থেলেস, সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো খ্যাতিমান দার্শনিক ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটেসেরও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ৭৭৬ প্রাক সাধারণ অব্দে সর্বপ্রথম গ্রিকদের দ্বারা অলিম্পিক গেমস খেলা শুরু হয়। আর তারাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করে। গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয় পুরো পৃথিবীকে আলোর পথে অগ্রসর করে দেয়।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসেরে বর্তমান আলোকচিত্র (Source: history৪kids.co)

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: history৪kids.co)

গ্রিক সভ্যতার নগর-রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান (Source: britanica.com)

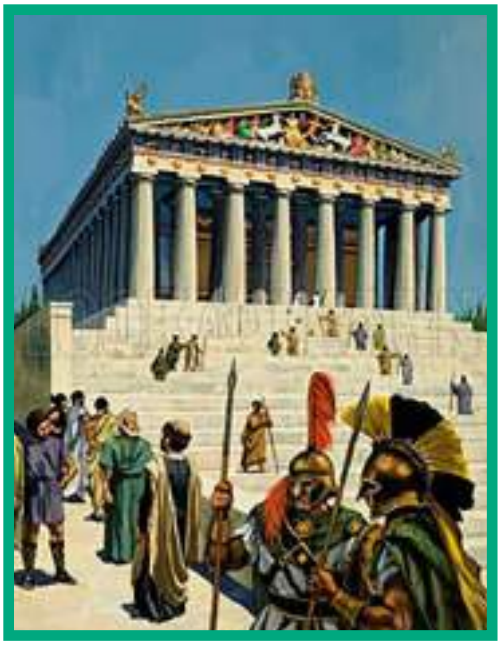

পার্সিপোলিসের সেকালের কাল্পনিক চিত্র।

অ্যাক্রোপলিসের বিভিন্ন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ।

অলিম্পিয়া নগরীর সেই সময়ের কাল্পনিক চিত্র।

করিন্থ নগর-রাষ্ট্র সেইসময়ে কেমন ছিল? ইতিহাসবিদগণ তা পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন।

গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র মাইসেনি সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে।

গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র ক্রিটের সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে। সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/en/

গ্রিক থিয়েটার (Source: worldhistory.org)

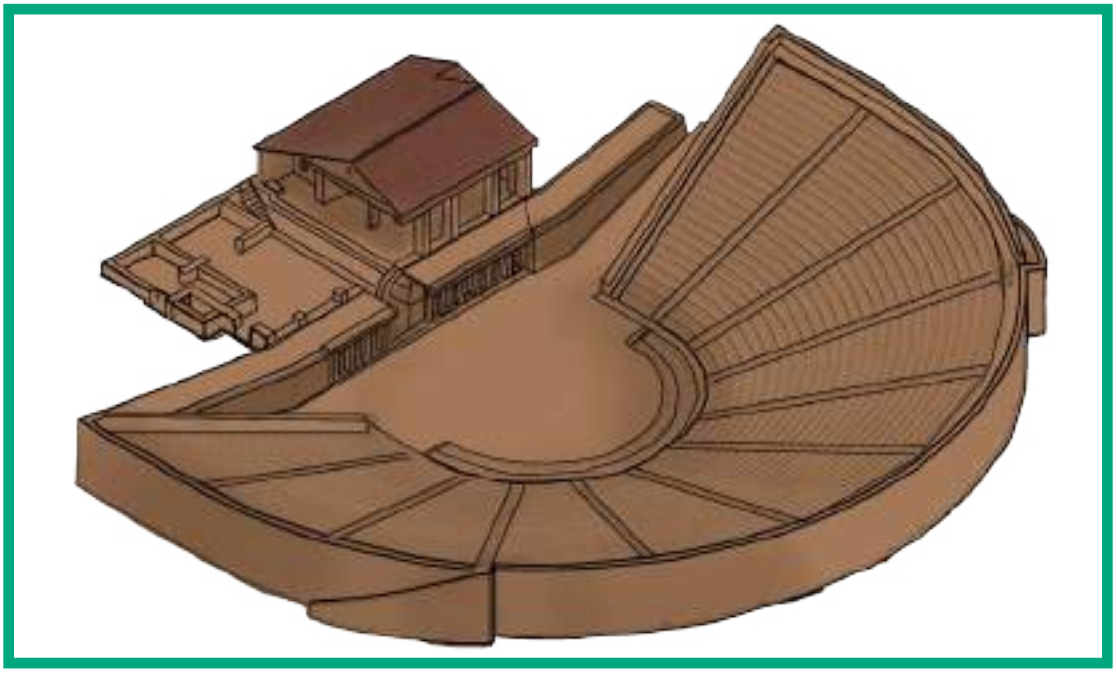

গ্রিক থিয়েটারের সেকশন ড্রয়িং (Source: theaterseatstore.com)

গ্রিসে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। এসব মৃৎপাত্রের মধ্যে একধরনের মৃৎপাত্র খুব বিখ্যাত ছিল। সেগুলোকে অ্যাম্ফোরা বলা হতো। সাধারণত বিভিন্ন জিনিস ও তরল পদার্থ সংরক্ষণ করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হলেও, অভিজাত শ্রেণির মানুষজন অন্যান্য কাজেও এগুলো ব্যবহার করতেন। বহু অ্যাম্ফোরার উপরে বিভিন্ন চিত্র আঁকা থাকতো। এই চিত্রগুলো সেই সময়ের গ্রিসের জীবনযাপন ও সমাজ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য দেয়। উপরের অ্যাম্ফোরার বাইরের দিকে একটি দৌড় প্রতিযোগিতার চিত্র আঁকা রয়েছে। এসব অ্যাম্ফোরা বাণিজ্যিক ভাবে বা কোনো জিনিস সংরক্ষণ করে সমুদ্রপথে দুরে রপ্তানী করা হতো। ভারত উপমহাদেশের অনেক স্থান থেকেও এমন অ্যাম্ফোরা বা খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে।

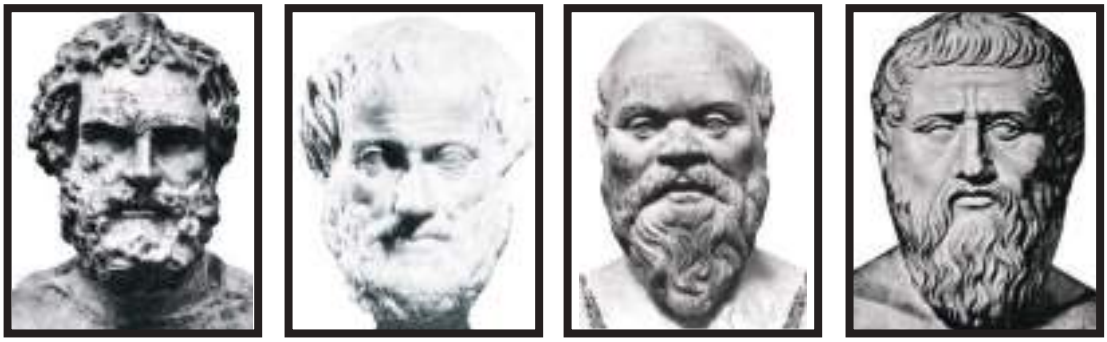

গ্রিসের সেই সময় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা হত বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে। অনেক গ্রিক চিন্তাবিদের প্রভাব আমাদের গণিত-দর্শন-বিজ্ঞান-জ্যোতির্বিজ্ঞান-চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়েছে। তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এমনই চারজন চিন্তাবিদের ভাস্কর্যের ছবি এখানে রয়েছে। বাম থেকে ডানে: থেলেস (প্রাক সাধারণ ৬২৩-৫৪৫ অব্দ); অ্যারিস্টটল (প্রাক সাধারণ ৩৮৪-৩২২ অব্দ); সক্রেটিস (প্রাক সাধারণ ৪৭০-৩৯৯ অব্দ); প্লেটো (প্রাক সাধারণ ৪২৭-৩৪৭ অব্দ)

গ্রিস সভ্যতায় প্রাচীন গ্রিসের দেবতা ও দেবীদের নিয়ে অনেক গল্প ও কাহিনি লেখা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন ধরনের চিত্র আঁকা হয়েছে। মহাকবি হোমার লিখিত ইলিয়াড ও অডিসি নামের মহাকাব্যে এই দেব-দেবীরা মানুষের সঙ্গে নানা ঘটনা ও যুদ্ধে সম্পর্কিত থাকেন। তোমরা বড় হয়ে ওই সময়ের গ্রিক দেবতা ও দেবীদের নিয়ে তৈরি করা অনেক সিনেমাও দেখতে পারবে। গ্রিকদের পুরাণকথা অনুসারে স্বর্গের অলিম্পাস পর্বতে বারোজন দেবতা ও দেবী থাকেন। তারা হলেন: আকাশ, বজ্রপাত, আইন ও বিচারের দেবতা ও দেবতাদের

অ্যানিমেশন বা কার্টুনের চিত্রে যদি গ্রিক দেবতা ও দেবীদের দেখতে চাও তাহলে তাদের চেহারা এমন হবে।

হেডিস

আফ্রোদিতি

পসাইডন

রাজা জিউস; বিবাহ, নারী ও শিশুর জন্ম-পরিবারের দেবী হেরা; সমুদ্র, পানি, ঝড় ও ভূমিকম্পের দেবতা পসাইডন; উর্বরতা, কৃষিকাজ, প্রকৃতি ও ফসলের দেবী দিমিতার; জ্ঞান, হস্তশিল্প, যুদ্ধ ও বীরত্বের দেবী অ্যাথেনা; শিল্পকলা, দর্শন, সত্য, কবিতা ও চিকিৎসার দেবতা অ্যাপোলো; সুরক্ষা, শিকার, ধনুর্বিদ্যা ও প্লেগ মহামারীর দেবী আর্তেমিস; যুদ্ধ, সংহিসতা,ও রক্তপাতের দেবতা অ্যারিস; সৌন্দর্য্য, ভালোবাসা, আবেগ, সৃষ্টি ও আকাঙ্খার দেবী আফ্রোদিতি; কারিগরি, প্রকৌশল, আগুন ও আবিষ্কারের দেবতা হলেন হেফাস্টাস; বাণিজ্য, যোগাযোগ, কূটনীতি, খেলাধূলা ও ভ্রমনের দেবতা হার্মিস; স্বাস্থ্য, আগুন, ঘরের কাজ ও পরিবারের দেবী হলেন হেস্টিয়া; উর্বরতা, আনন্দ, বিনোদন ও পুনর্জন্মের দেবতা ডায়োনিসাস। এই বারোজন দেবতা ও দেবীর মধ্যে কয়েকজনের ভাস্কর্য তোমাদের জানার জন্য দেওয়া হলো।

গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের কোনো কাহিনিই পুরোপুরি বোঝা যাবে না যদি সমুদ্রের সঙ্গে গ্রিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা না-জানি। দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ আর যুদ্ধের জন্য গ্রিকরা নৌযুদ্ধের বিভিন্ন জাহাজ ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্যও তারা বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত। জাহাজ নির্মাণ ও চালনায় গ্রিকরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। জাহাজকে ট্রিয়েম বলা হতো। বিভিন্ন লিখিত সূত্রে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিতো। বেশির ভাগ নামই দেবতা-দেবী, স্থান, প্রাণী, বস্তু বা ধারণার (যেমন: স্বাধীনতা, গৌরব, সাহস ইত্যাদি) নামে হতো। নিচে গ্রিকদের কয়েকটি ধরনের জাহাজের চিত্র তোমাদের দেখার জন্য দেওয়া হলো। এ ধরনের জাহাজ কি তোমরা কাগজ দিয়ে বানাতে পারবে? চারপাশের বিভিন্ন জিনিস দিয়েও তোমরা এমন জাহাজ বানানোর চেষ্টা করতে পারো?

নৌযুদ্ধ

যুদ্ধজাহাজের বহর

বড় জাহাজ ও ছোট নৌকার মিলিয়ে
যুদ্ধের জন্য তৈরি করা নৌবহর

মালবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ

সভ্যতা যেমন জীবন-প্রযুক্তি-স্থাপত্য-চিন্তায় বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তেমনই সভ্যতার শাসকগণ অন্য অঞ্চল দখল করতে চান। একটি রাজত্বের সঙ্গে আরেকটি রাজত্বের যুদ্ধ হতো। রাজা বা সম্রাটগণ অন্য রাজ্য বা লোকালয় দখল করতে গিয়ে নৃশংস অত্যাচার করতেন। অনেক মানুষকে হত্যা করতেন। অন্যদের বসতি ধ্বংস করতেন। বেশির ভাগ সভ্যতায় শাসকগণ পরাজিত মানুষজনের অনেককে দাস হিসেবে বন্দী করে নিয়ে আসতেন। এই দাসদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বিভিন্ন কঠিন শ্রমের কাজে ব্যবহার করা হতো। সভ্যতার বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপনা তৈরি করেছিল প্রধানত এই দাসগণ। গ্রিক বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যেও যুদ্ধ লেগেই থাকত। উপরে গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র।

রোমান সভ্যতা: সাম্রাজ্য ও ভাঙন

রোমান সভ্যতা ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি সভ্যতা ছিল। আর রোমান সাম্রাজ্য ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শাসনক্ষমতা ধরে রেখে তার অঞ্চল শাসন করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ৭৫৩ প্রাক সাধারণ অব্দে নির্বাসিত দুই রাজপুত্র রোমিউলাস ও রেমাস সিংহাসন পুনরাধিকার করে যে নগরী নির্মাণ করেন, রোমিউলাসের নামানুসারেই নগরীর নামকরণ করা হয় রোম।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণাংশের ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীর পত্তন ঘটে। ইতালি ভূখণ্ডের মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগরের অবস্থান। টাইবার ইতালির দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী, এপেনীয় পর্বতশ্রেণি থেকে শুরু হয়ে টাইরেনিয়ান (Tyrrhenian) সাগরে মিলিত হয়েছে। ইতালির তিন দিকে সাগর। উত্তরে আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে অ্যাড্রিয়াটিক এবং পশ্চিমে ইট্রুস্কান সাগর রয়েছে।

রাষ্ট্র

রোমের শাসকেরা সামরিক শক্তির সাহায্যে তাদের কর্তৃক ইতালির অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। আর রোমান রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। তার পরেই ক্ষমতার অধিকারী

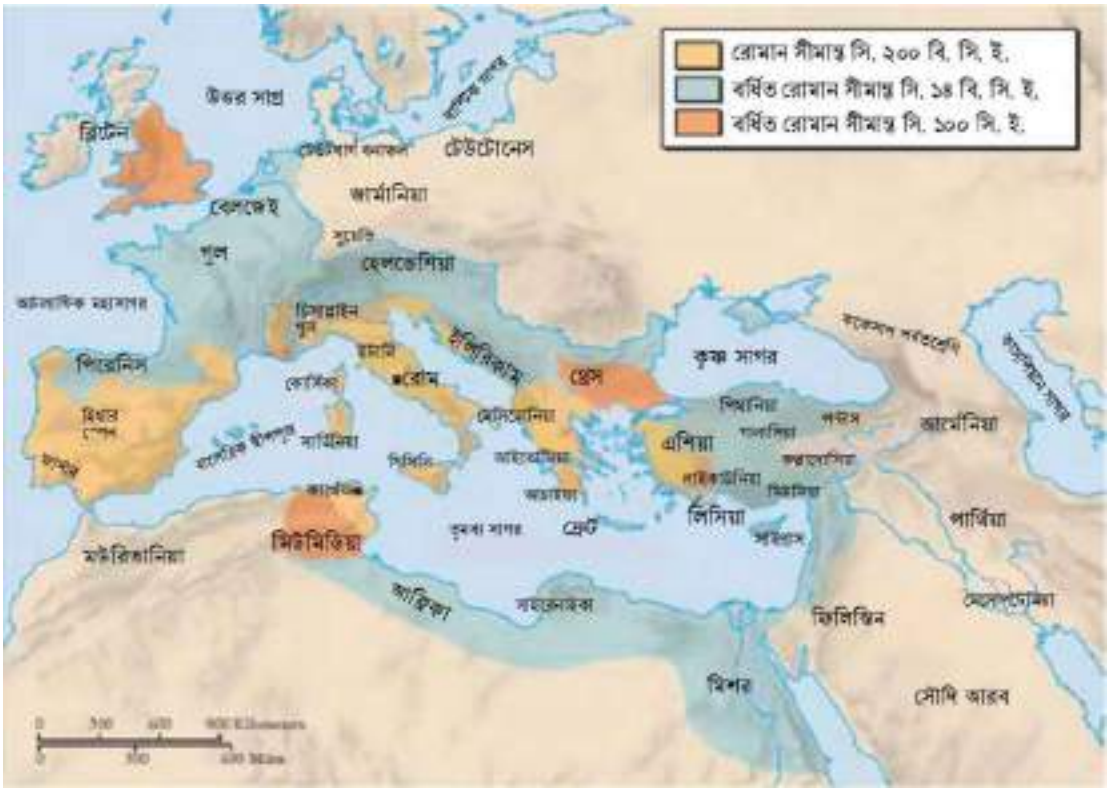

রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ (১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) (Source: Adler, P. J. & Pouwels, R. L., ২০১০,World Civilizations,৬th ed.)

ছিল সিনেট। প্রাক সাধারণ অব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজতন্ত্র উৎখাত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। রাজতন্ত্র অবসানের আগেই রোমের জনগণ প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্যাট্রিসিয়ান অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণি, প্লেবিয়ান রোমের সাধারণ নাগরিক। রোমে প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ৫০০ বছর, আর রাজতন্ত্র বিরাজমান ছিল পরবর্তী ১ হাজার ৫০০ বছর।

সমাজ ও অর্থনীতি

রোম নগরীর পত্তনের পর থেকেই ক্রমশ লোকজনের বসতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। সাধারণভাবে রোমানরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে একক ও ঐক্যবদ্ধ একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সফল হয়েছিল। সে কারণে তাদের জীবনযাপন প্রণালি ব্রিটেন থেকে মিসর এবং স্পেন থেকে রোমানিয়া পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করেছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় সাধারণ অব্দে যখন রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হচ্ছিল, তখনকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনসম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যায়। এ সময় বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন করেছিল। বাণিজ্য প্রধানত সাম্রাজ্যের গণ্ডিতে পরিচালিত হতো, কিন্তু সিল্ক রোড এবং ভারত, আফ্রিকা এমনকি চীন পর্যন্ত এটি প্রসারিত হয়েছিল।

কৃষি

সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য রোম একটি উপযুক্ত স্থান ছিল। টাইবার নদী প্রাচীন রোমে কৃষি বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল, যে কারণে এটি কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে ওঠে। টাইবার নদীটি রোমকে মিঠাপানি ও উর্বর মাটির যোগান দিয়েছিল। তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফসল ছিল আঙ্গুর, জলপাই ও খাদ্যশস্য। কারণ, আঙ্গুর থেকে মদ এবং জলপাই থেকে তেল উৎপাদন করা হতো। দুধ, মাংস ও পনিরের চাহিদা পূরণের জন্য গরু, ভেড়া ও ছাগল পালন করত।

স্থাপত্য

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। প্রাচীন রোমের স্থাপত্যের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যা এর আগে ছিল না। খিলান, ভল্ট ও গম্বুজের ব্যবহার তাদের স্থাপত্যে অনেক বেশি সার্থক হয়ে উঠেছে। সম্রাট হাইড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির 'প্যান্থিয়ন' রোমের অন্যতম বৃহৎ স্থাপত্যিক নিদর্শন। রোমেই তৈরি হয়েছে 'কলোসিয়াম' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা, যেখানে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারে। রোম শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি আয়তাকার ফোরাম বা প্লাজা যার চারদিকে প্রাচীন রোমের অনেক স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই কাঠামোটি রোমান জনজীবনের বিভিন্ন দিককে একত্রিত করেছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রের যুগে এই স্থানে গণসমাবেশ, সালিশ, গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ ইত্যাদি হতো এবং এখানে তখন প্রচুর দোকান ও খোলা বাজার ছিল। রোম সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হওয়ার পর যখন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তখন এখানে বেশ কিছু মন্দির ও সৌধ নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া রোমানরা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে পানি সরবরাহের জন্য খিলানযুক্ত কৃত্রিম নালা তৈরি করে, যাকে বলা হয় অ্যাকুইডাক্ট। রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে সুউচ্চ প্রায় ২৬০ মাইল অ্যাকুইডাক্ট ছিল। রোমান স্থাপত্যের অন্যতম আরেকটি নিদর্শন ছিল গোসলখানা বা বাথ স্পা। কিন্তু এটি রোমানদের শুধু গোসলখানা হিসেবে নয়, বরং আড্ডা দেওয়া ও গল্প করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। রোমানদের তৈরি এপ্পিয়ান রাস্তাটি এখন পর্যন্তও দৃশ্যমান রয়েছে। এগুলোতে ব্যবহৃত নকশা এতোই অনন্য ছিল যে এর শৈলীকে আমরা আজও রোমানেস্ক (Romanesque) হিসেবে অভিহিত করি। বেশির ভাগ ভবন পাথর, কাঠ ও মারবেল দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। রোমের মারবেলের সবচেয়ে কাছের উৎস ছিল তুস্কানি (Tuscany)।

শিল্পকলা

রোমান শিল্পের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ ছিল চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য ও মোজাইকের কাজ। ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম ধাতু, রত্ন-পাথর, হাতির দাঁত ও কাচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। রোমান ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে চরম সাফল্য হচ্ছে পূর্ণাবয়ব এবং আবক্ষ মূর্তি দ্বারা মনুষ্য প্রতিকৃতি নির্মাণ। রোমান শিল্প গ্রিকদের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। রোমান চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু হলো প্রাণী, স্থির জীবন, প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড, মিথোলজি ইত্যাদি।

রোমান ধর্ম

প্রাচীন রোমের ধর্ম ছিল প্যান্থিস্টিক অর্থাৎ একাধিক ঈশ্বরে তারা বিশ্বাস করতো। তবে তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার যিনি ছিলেন আকাশের দেবতা। প্রকৃতপক্ষে রোমানরা বহু দেব-দেবীর উপর বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অন্যতম ১২ জন দেবতাকেই বিশ্বাস করতেন। এরা হলেন জুপিটার, জুনো, স্যাটার্ন, নেপচুন, প্লুটো, মার্চ, ভেনাস, মার্কারি, অ্যাপোলো, ডায়ানা, মিনার্ভা ও সেরেস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তার করলে চতুর্থ সাধারণ অব্দে রোমান সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এটি রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

আইন

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। প্রাক সাধারণ ৪৫০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে আইনগুলো খোদাই করে জনগণের জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই লিখিত আইনকে ‘হেবিয়াস কর্পাস’ বলে। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রোমানদের আইনকে আধুনিক পাশ্চাত্য আইনের ভিত্তি বলা হয়।

দর্শন ও সাহিত্য

দর্শন ও সাহিত্য চর্চায়ও রোম পিছিয়ে নেই। রোমান যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার প্লুটাক ১২টি নাটক লেখেন, যেগুলোতে তিন শতকে রোমের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। রোমের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদের নাম ‘স্টোয়িকবাদ’। এ মতবাদের দার্শনিকেরা মনে করেন, সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়া।

রোমান সভ্যতার পতন

রোমে বসবাসকারী আদি অধিবাসীদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ একটি সাধারণ বিষয় ছিল। নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ৪৭৬ সাধারণ অব্দে জার্মান বর্বর জাতিগুলোর হাতে রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল।

প্যান্থিয়ন

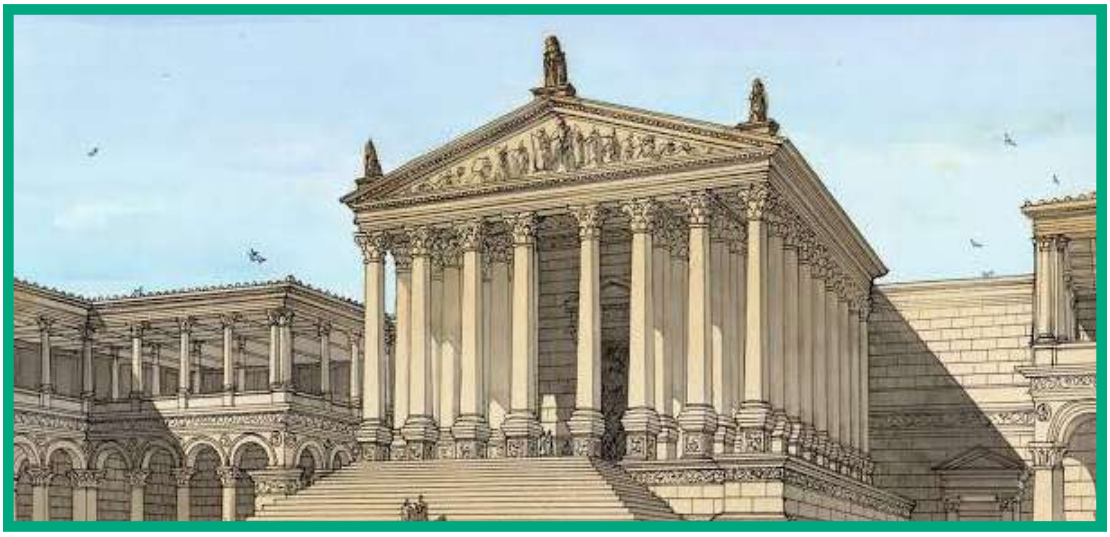

রোমের প্যান্থিয়ন মন্দির প্রথম দিকে দেখতে কেমন ছিল? শিল্পীর কল্পনায়। প্যান্থিয়ন নির্মাণ করার পরে এই স্থাপত্য মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরে এই মন্দিরকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। এই স্থাপনার উপরে যে গম্বুজটি দেখতে পাচ্ছ সেটা আধুনিক কালের আগে সবচেয়ে বড় গম্বুজ ছিল।

রোমান সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রতীক হিসেবে যে স্থাপত্যটিকে আধুনিককালে বিবেচনা করা হয় সেটা হলো কলোসিয়াম। কলোসিয়াম হলো একটি গ্যালারি ঘেরা খোলা অঙ্গন। গ্যালারি কয়েকতলা বিশিষ্ট। এই ধরনের স্থাপনাকে অ্যাম্ফিথিয়েটার বলা হয়। তবে কলোসিয়ামের স্থাপত্য আরও বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট। নিচে রোমান কলোসিয়ামের ভগ্ন বর্তমান অবস্থা আর সেটা কেমন ছিল তা দেওয়া হয়েছে। এই স্থাপনা রোমান সম্রাটদের নির্দেশে নির্মাণ করা হলেও এটা নির্মাণে প্রায় এক লক্ষ ক্রীতদাস কাজ করেছিলেন। এই কলোসিয়াম তৈরি হয়েছিল রোমানদের বিনোদনের জন্য। দাসদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ, অথবা একজন দাসের সঙ্গে বাঘ বা সিংহের মতন হিংস্র প্রাণীর প্রাণঘাতি লড়াই দেখার জন্য এখানে রোমের মানুষজন জড়ো হতেন। অসংখ্য দাস এই বিনোদনে মৃত্যুবরণ করেন। এদেরই মধ্যে একজন দাস এই অন্যায় বিনোদনের বিরুদ্ধে আর নিজেদের স্বাধীনতার জন্য দাসবিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। তার নাম ছিল স্পার্টাকাস।

কলোসিয়ামের তখনকার চেহারা কেমন ছিল? হিংস্র পশুদের সঙ্গে ক্রীতদাসদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হত। সেই জন্তুদের খাঁচা আর গ্লাডিয়েটরদের কাল্পনিক চিত্র

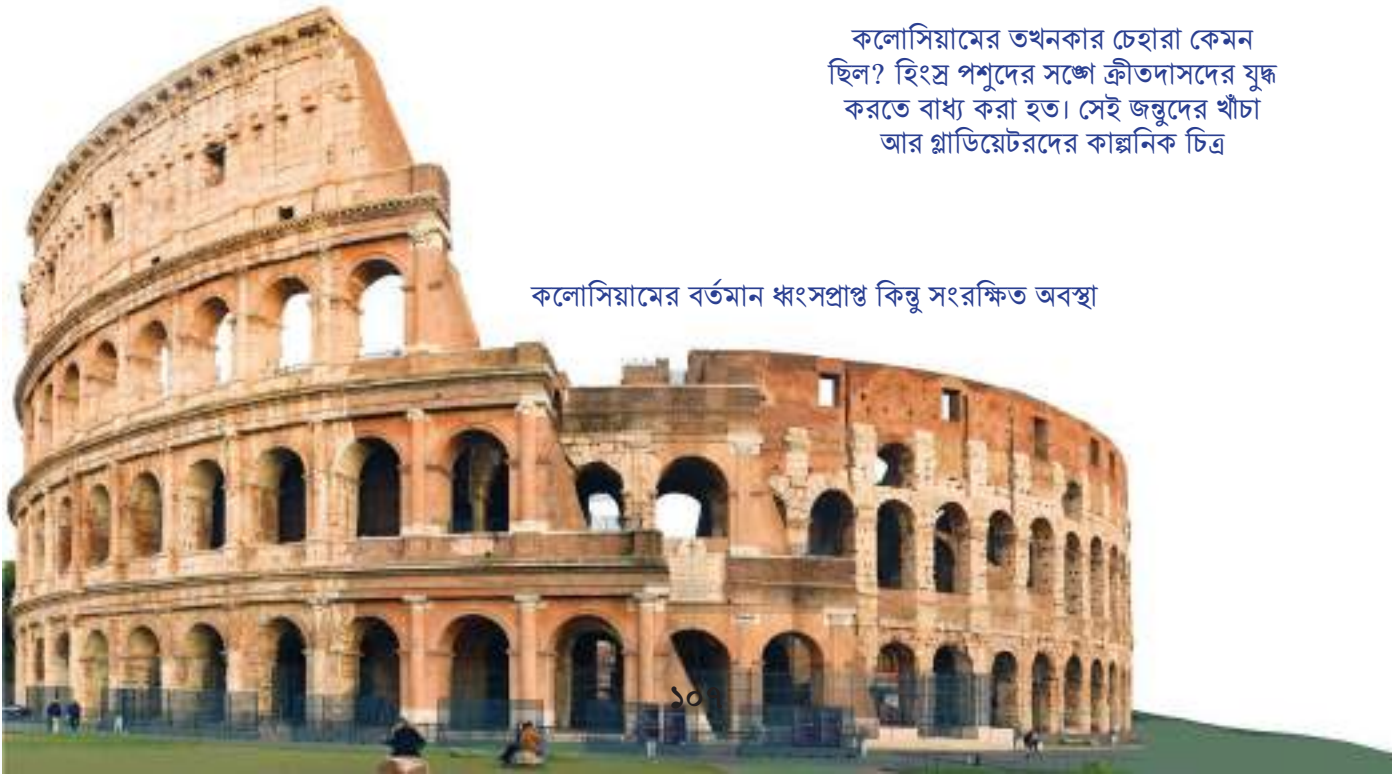

কলোসিয়ামের বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু সংরক্ষিত অবস্থা

কলোসিয়ামে ক্রীতদাসগণ গ্লাডিয়েটর হিসেবে মৃত্যু না হওয়া অব্দি একজন আরেকজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন। গ্যালারিতে বসে দর্শকগণ সেই যুদ্ধ দেখে বিনোদন পেতেন। এমনই একটি দৃশ্যের কাল্পনিক চিত্র।

বন্দী নারী ও পুরুষদের ক্রীতদাসদের কেনাবেচার বাজরের কাল্পনিক চিত্র।

দাসদের অমানবিকভাবে কাজ করতে বাধ্য করা হতো।

রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থার অত্যাচার ও বন্দিত্ব থেকে স্বাধীনতার জন্য দাসগণ যার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি হলেন স্পার্টাকাস

কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিজ্ঞানী রোমান সেনাবাহিনীর একসময়ের জেনারেল ও পরে সম্রাট জুলিয়াস সিজারের চেহারা সৃষ্টি করেছেন (ডানে)। বামে জুলিয়াস সিজারের ভাস্কর্য।

কয়েকজন রোমান সম্রাটের কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে আঁকা প্রতিকৃতি।

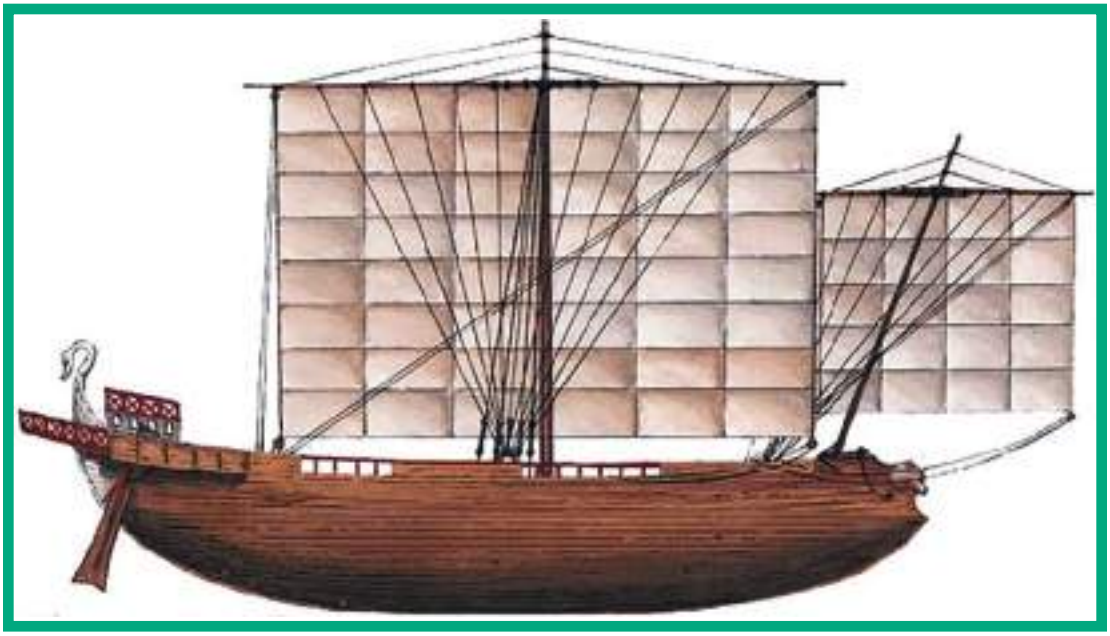

এক ধরনের রোমান পরিবহন জাহাজের মডেল

রোমান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের সৈন্য। কাল্পনিক চিত্র।

রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিল রোমান সেনাবাহিনী। বিভিন্ন ধরনের স্তরবিশিষ্ট বিশাল সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের উপরে নিয়ন্ত্রণ করায় ভূমিকা রাখত। নতুন নতুন এলাকায় আক্রমণ করে নৃশংসভাবে অত্যাচার করে মানুষকে হত্যা করতো। বন্দী করে নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করত এসব মানুষকে রোমান রাষ্ট্র, সম্রাট, ও অভিজাতবর্গ। এই সেনাবাহিনী ছাড়া রোমান সভ্যতা ও সাম্রাজ্য বিকশিত হতো না, টিকেও থাকতো না।

রোমান সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ও হত্যার কাল্পনিক চিত্র।

রোমান নৌবহরের কাল্পনিক চিত্র।

বিভিন্ন ধরনের রোমান যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে একধরনের যুদ্ধ জাহাজ। যে বৈঠাগুলো দেখা যাচ্ছে, এই বৈঠা টানার দায়িত্ব পালন করতে দাসদের বাধ্য করা হতো।

রোমান নৌবহরের সঙ্গে সমুদ্রযুদ্ধ (কাল্পনিক চিত্র)

রোমান একটি বন্দরে বিভিন্ন ধরনের নৌকা ও জাহাজ। এখানে যুদ্ধ জাহাজ ও পণ্য পরিবহনের জাহাজসহ নানা ধরনের নৌপরিবহনের বাহন রয়েছে। কাল্পনিক চিত্র।

রোমান সাম্রাজ্যের সড়ক ব্যবস্থা

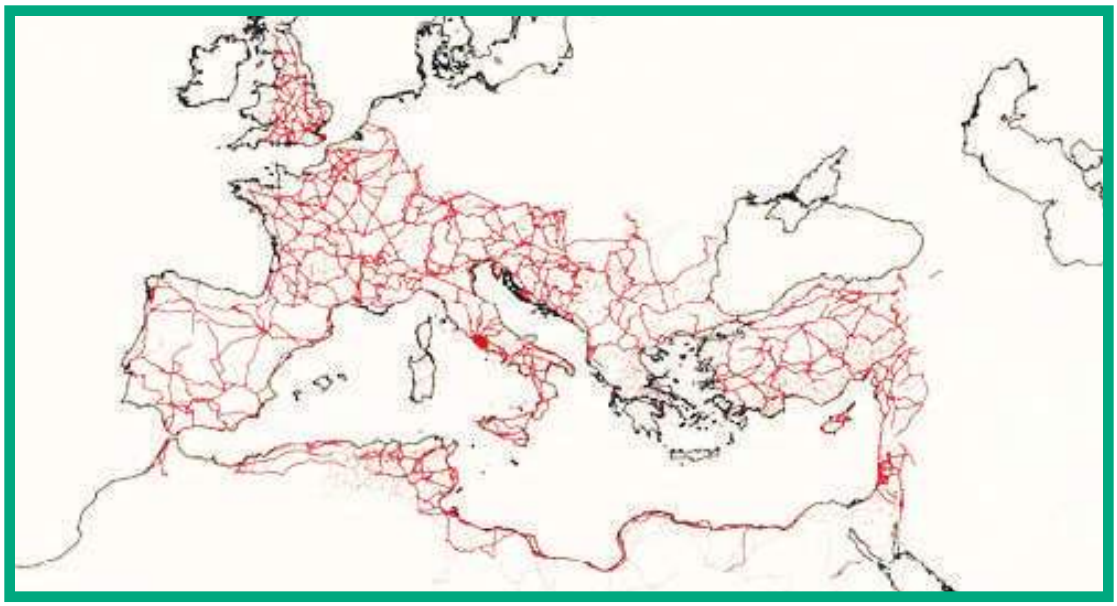

রোমান প্রকৌশলী-কারিগর-শ্রমিকদের নির্মাণ করা সড়ক রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিল। যুদ্ধ, যাতায়াত, পরিবহনের জন্য, বিভিন্ন দূরের অঞ্চলের উপরে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সড়কের নেটওয়ার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রোমান রাষ্ট্র এই সড়ক তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছিল। এই সড়কগুলো তৈরি করার জন্য রোমানগণ দাসদের ব্যবহার করত।
(https://i.redd.it/il৯৬০৩y০pvz৫১.jpg)

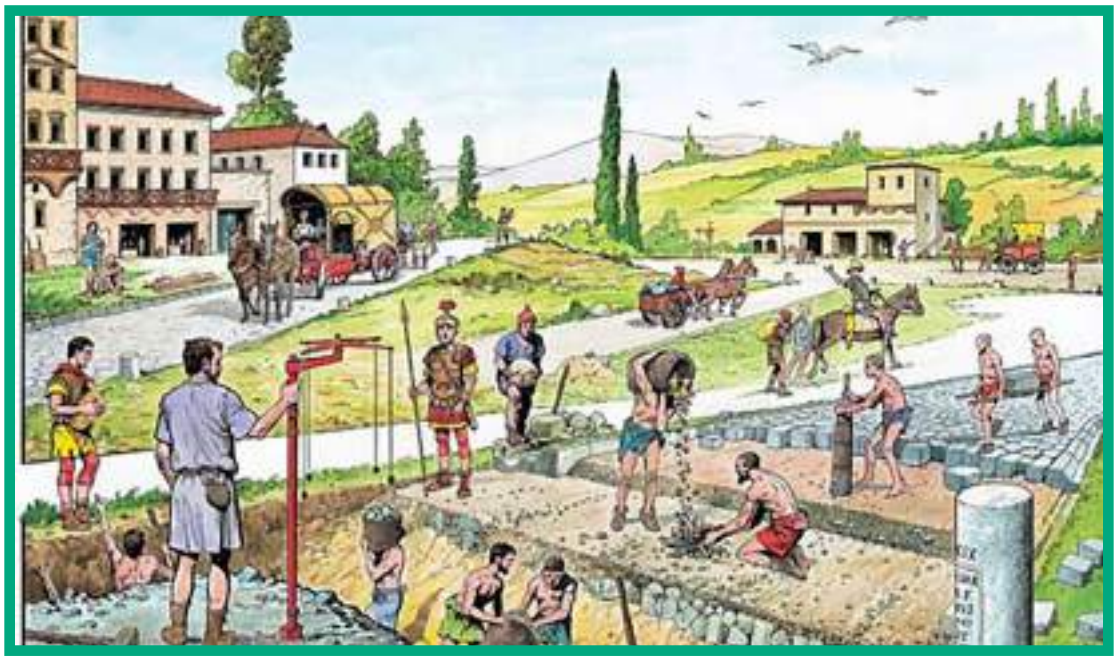

রোমান প্রকৌশলী এবং করিগরগণ স্তরে স্তরে মাটি-পাথর ফেলে রাস্তা তৈরি করতেন। রাস্তা তৈরি করার একটি কাল্পনিক দৃশ্য।

প্রাচীন রোমের এপ্পিয়ান রাস্তা (Source: britanica.com)

রোমানদের নগর ও স্থাপনাগুলোতে দূর থেকে পানি সরবরাহ করার জন্য আলাদা স্থাপনা ও ব্যবস্থা তৈরি করেছিল রোমানরা। পাইপ, খাল, ড্রেইন, সেতু ইত্যাদি মিলিয়ে একটি জটিল ও উন্নত প্রকৌশল ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে ফ্রান্সে অবস্থিত গাখদ নদীর উপরের সেতুর মতন দেখতে স্থাপনাটি রোমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থারই একটি অংশ ছিল। (Source: britanica.com)

প্রায় ৩৫ বছর ধরে গবেষণা করে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন রোমের এই মডেলটি তৈরি করেছেন। তখনকার রোমান সভ্যতার কেন্দ্র রোম নগরী আকাশ থেকে দেখতে ঠিক এমনই ছিল।
রোম নগরের মডেলটির দৃশ্য। (সূত্র: https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/imperialfora/model.html#:~:text=To%২০commemorate%২০the%২০birth%২০of,had%২০reached%২০its%২০greatest%২০size.)

কার্থেজ, রোমান নগরী (কাল্পনিক চিত্র) (সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/)

আলেকজান্দ্রিয়া নগরের প্রধান একটি সড়কের দৃশ্য। আলোকজান্দ্রিয়া মিসরীয়, গ্রিক, রোমান ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সময় নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (কাল্পনিক) (সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/)

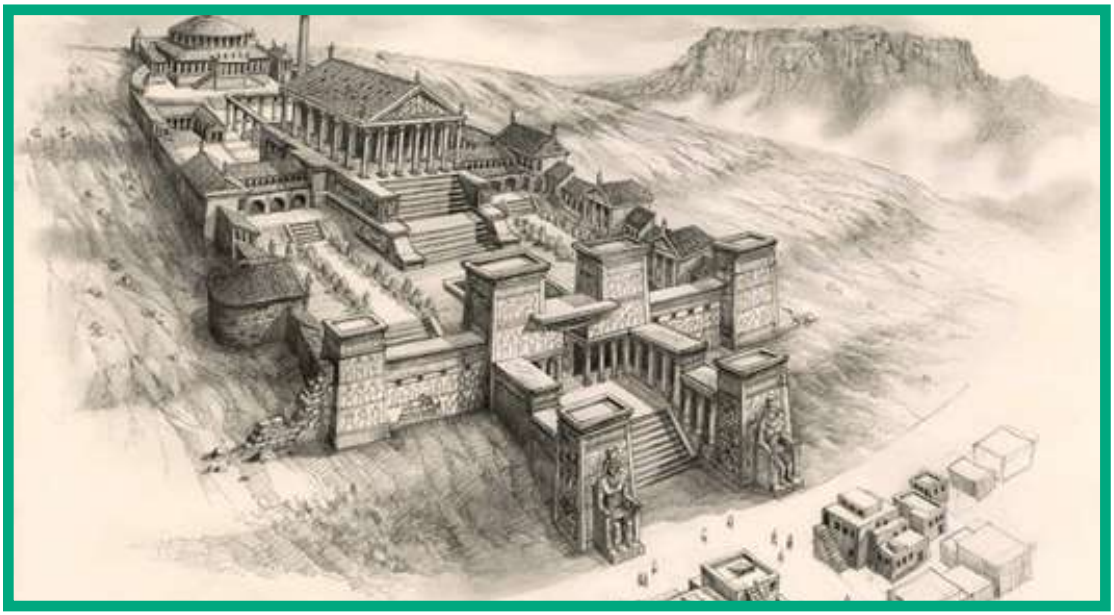

আলেকজান্দ্রিয়া নগর কেবল বহুকাল ধরে বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র, বিভিন্ন অঞ্চলের মিলনকেন্দ্র, বন্দরই ছিল না। এই নগরের দুটো গ্রন্থাগার ওই সময়ে সবচেয়ে বেশি পাণ্ডুলিপি (সেই সময়ের বই) সংগ্রহ করেছিল। পরে এই দুটো গ্রন্থাগারই ধ্বংস করা হয়।
https://peripluscd.files.wordpress.com/২০১৪/০১/libraryofalexandria.jpg

রোমান সাম্রাজ্যের দুই অংশ: পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য।

কনস্টানটিনোপল নগরী (এখনকার তুরস্কের ইস্তাম্বুল) (কাল্পনিক চিত্র)

বাইজেনটাইন সময়ের অন্যতম বিস্ময়কর স্থাপত্য আয়া সোফিয়া

রোমান ও গ্রিক সভ্যতার মিল ও অমিল খুঁজে বের করি।

মিল	অমিল

খেলা: এক পা করে সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়া

এই খেলাটি আমরা শ্রেণিকক্ষের বারান্দায়, মাঠে বা অন্য কোনো খোলা জায়গায় খেলতে পারি। আমরা প্রত্যেকে সাতটি দলে ভাগ হই। লটারি করে একটি সভ্যতা নির্বাচন করি। এবারে প্রতিটি দলের একজন করে প্রতিনিধি এক লাইন বরাবর পাশাপাশি দাঁড়াই। প্রত্যেকে তারা যে সভ্যতাটি লটারিতে পেয়েছে সেটি বড় করে লিখে হাতে নিয়ে দাঁড়াই। শিক্ষক খুশি আপা বা অন্য দলের সদস্যরা প্রতিটি দলকে সেই সভ্যতাসংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করবে, যেটির উত্তর একটি শব্দে দেওয়া যায়। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে তারা এক পা এগোবে। ভুল হলে সেই জায়গায়ই থাকবে। এভাবে প্রতিটি দলকে প্রশ্ন করা হবে ১০টি। দেখিতো কোন সভ্যতা সবচেয়ে এগিয়ে যেতে পারে?

নিচের ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করে রোমান সভ্যতার মূল সাতটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লেখার চেষ্টা করি:

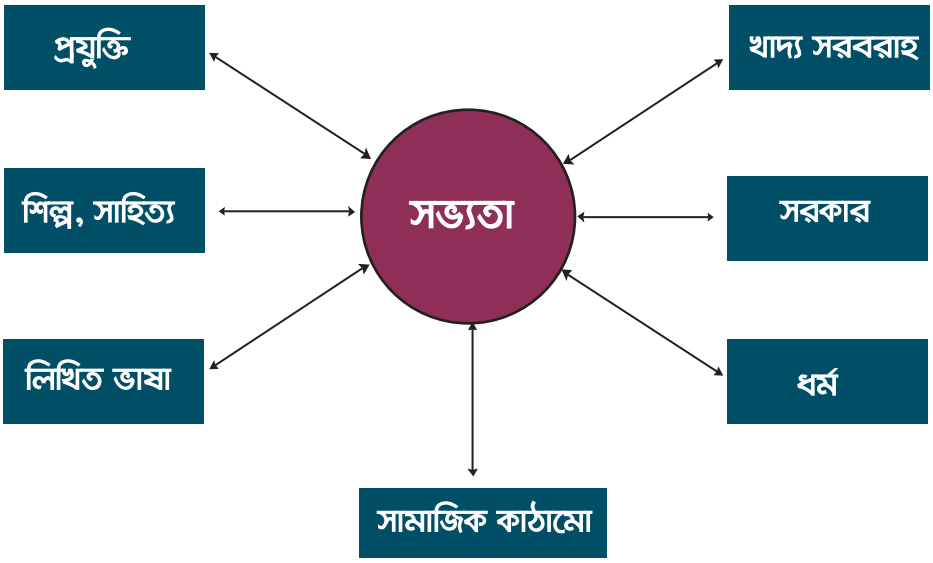

কাগজের উড়োজাহাজে সভ্যতার নিদর্শন:

তোমরা একটি কাগজে কোনো একটি সভ্যতাসংক্রান্ত একটি তথ্য বা, ছবি বা কোনো ঘটনা একে বা লিখে তা দিয়ে একটি কাগজের উড়োজাহাজ বানাও। বন্ধুদেরও বলো তাই করতে। এবারে সবাই একেকজনের দিকে ছুড়ে দাও সেই উড়োজাহাজ। আর প্রত্যেকেই বন্ধুদের ছোড়া যেকোনো একটি উড়োজাহাজ ধরার চেষ্টা করো। কাগজটি খুলে পড়ো। দেখো তো এটি কোন সভ্যতাকে নির্দেশ করে? সেটা কাগজটিতে লেখো। এবারে এগুলো দেয়ালে আটকাই সবাই। একে অন্যেরটা দেখি, ভুল থাকলে শুধরে নিই।

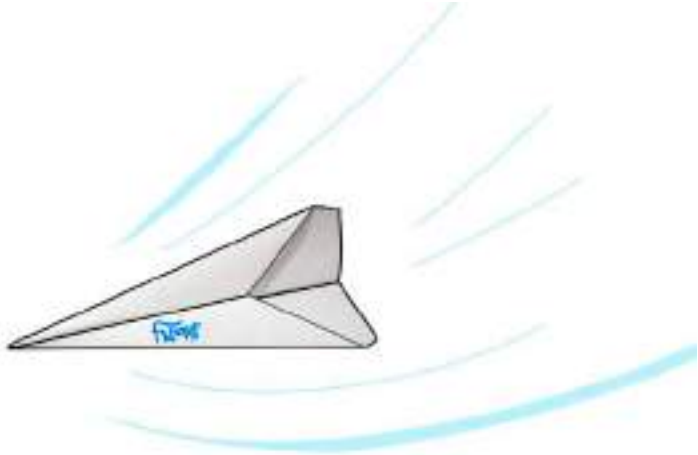

সময় রেখা তৈরি :

আমরা তো বেশ কিছু সভ্যতা সম্পর্কে জানলাম। এগুলো একেক সময়ে গড়ে উঠেছে। এবারে এসো আমরা সবচেয়ে আগের সভ্যতা থেকে শুরু করে পর পর সময় অনুযায়ী সভ্যতাগুলো সাজাই। সঙ্গে প্রতিটি সভ্যতা কোন এলাকায় গড়ে উঠেছে তা-ও উল্লেখ করব:

পরবরর্তী সময়ে নতুন কোনো সভ্যতা সম্পর্কে পরিচিত হলে সেটিও যোগ করে দিও এই সময় রেখায়। তোমরা শ্রেণিকক্ষে ছোট ছোট কাগজ কেটে এ রকম কিছু বানিয়ে দেয়ালজুরে লাগাতে পারো।

প্রথম ঘটা ঘটনাগুলো তুলে ধরি:

বিভিন্ন সভ্যতার সময়কালে বিভিন্ন স্থানে প্রথম কিছু আবিষ্কার হওয়া বা ঘটনা ঘটার কথা পড়েছ তোমরা। চলো সেগুলো খুঁজে বের করি:

প্রথম	নাম	সভ্যতা	স্থান	সময়
কাগজ	প্যাপিরাস	মিশরীয়	মিশর	

প্রথমে এগুলো ছোট ছোট কাগজে লিখি। এরপর এগুলো সময়ের ক্রম অনুযায়ী পর পর সাজাই। বোঝার চেষ্টা করি কোন আবিষ্কারের পর কোনটি ঘটেছে? একই সময়ে কী কী নতুন আবিষ্কার হয়েছে? একই স্থানে কী কী আবিষ্কার হয়েছে?

পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিভিন্ন সভ্যতাকে চিহ্নিত করি। এগুলো কোন মহাদেশে অবস্থিত তা চিহ্নিত করি।